বিজ্ঞান কথা

বিশেষ কোভিড সংখ্যা

বি P
V প্র
VIGYAN PRASAR

- রোগী-চিকিৎসকের অধিকার ও কর্তব্য এবং কোভিড-১৯ । ২
- সামাজিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও কোভিড-১৯ । ৩
- কোরোনা ভাইরাস সংক্রমণ: স্বাস্থ্য বিপর্যয় ও তার মোকাবিলার উপায় । ৪
- ভারতীয় পেটেন্ট আইনে পেটেন্ট সুরক্ষিত কোভিড-১৯ এর প্রতিষেধক ব্যবহারের অধিকার ও সুযোগ । ৫
- কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ, প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক । ৬
- অতিমারি থেকে অন্য-স্বাভাবিকতা – শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য ও যত্নের প্রসঙ্গ । ৮
- বোকা বাক্সে সহজ পাঠ । ১০
- কোরোনাভাইরাস: মানব ও প্রাণীস্বাস্থ্য – একই পুস্তকের দুটি অধ্যায় । ১১
- কোরোনাভাইরাস নিয়ে আর্থিক দুশ্চিন্তা । ১২
- মহাকাশযাত্রা ও কোয়ারান্টাইন । ১৩
- মানবজাতির কলঙ্কের এক নতুন অধ্যায় । ১৪
- মহামারী মডেল ও কোভিড-১৯ । ১৫
- এ.আই দ্বারা কোভিড-১৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয় । ১৬

সম্পাদকীয়

আজ মাস খানেক ধরে যেন শয়নে-স্বপনে-জাগরণে কোভিড আমাদের অস্তিত্বকে ছেয়ে ফেলেছে। দুঃস্বপ্নের মত এই অতিমারীর ভীতি, প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, জল্পনা ও গুজব, আমাদের প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তগুলোকে যেন আর কিছুতে মন দিতে দিচ্ছে না। কি এই রোগ? রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসটি এলোই বা কোথা থেকে? ছিল কোথায় অ্যাদ্দিন? প্রতিকার কি? প্রতিরোধ কিসে? দেশে দেশে লকডাউন। চাকরি চলে যাচ্ছে মানুষের। বেতন কাটা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা অসম্ভব অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে। নব্য-স্বাভাবিকতার সাথে খাপ খাওয়াতে হিমসিম খাচ্ছি আমরা সবাই। স্বতন্ত্রভাবে ও সম্মিলিত ভাবে আমাদের চেতনা পর্যুদস্ত হচ্ছে অবসাদে, অলীক ও অসম্ভব কল্পনায় ও সম্ভাব্য মৃত্যুত্রাশে। অপরিণামদর্শিতার তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়ক্ষতির মাশুল আমাদের দিতে হবে সম্মীলিতভাবে। তার ঠিক-বেঠিক পর্যালোচনা হতে থাকবে। আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরতে থাকবে। শুভ-অশুভের চিরকালীন দ্বন্দও চলতে থাকবে। ভবিষ্যত বলবে অবিমৃষ্যকারী মানুষের শাস্তি পাবার কথা। তাই মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব এই পরিবর্তনশীল জনজীবনের বিশ্লেষণ ও নথিকরণ। বিজ্ঞান অনুসন্ধান করছে শত্রুকে চেনার, প্রতিরোধ করার ও বিনাশ করার উপায় ও তা শুধু বৈজ্ঞানিক মহলে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়ছে, আলোচিত হচ্ছে সামাজিক ও গণ যোগাযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যেও।

চিকিৎসা শাস্ত্র করছে রোগীর পরিচর্যা ও শুশ্রূষা। সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, আইন, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা পর্যবেক্ষণ ও মননে ব্রতী এই অভূতপূর্ব প্রপঞ্চের। সত্যিই অভূতপূর্ব কি নাকি একটু অন্য অবতারে পুনরাবির্ভাব এই জৈব বিপর্যয়ের? বিস্তৃত আলোচনা ও বিতর্কের অবতারণার উপাদান বটে। কোনো বিষয়ে জানা বা তার সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না তার সম্যক স্বরূপ বিশ্লেষণের সংস্থান থাকে, বিশেষতঃ কোভিড-১৯এর মত বিশ্বব্যাপী এই ঘটনাপ্রবাহের।

সেই উদ্দেশ্যসাধনেই বিজ্ঞান প্রসারের ‘বিজ্ঞান কথা’র এই বিশেষ কোভিড সংখ্যার উদ্যোগ যা কোভিডের স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা করেছে বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে। এখানে আলোচিত দৃষ্টিকোণ তাই একাধারে বৈজ্ঞানিকের, চিকিৎসকের, বিবর্তনবাদীর, পদার্থবিদের, ভাইরোলজিস্ট, ইম্যুনোলজিস্ট, তথ্যপ্রযুক্তিবিদের, নভোতত্ত্ববিদের আবার অন্যধারে আইনজ্ঞের, অর্থনীতিবিদের, মনোস্তত্বের, শিক্ষকের, বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসকীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। উদ্দেশ্য একটাই - কোভিড-সম্বন্ধীয় একটি প্রামাণ্য সঙ্কলনের যা এই সময়টির প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার দৃষ্টান্ত রূপে অথচ বিষয়ভিত্তিক সীমাবদ্ধতা অনায়াসে অতিক্রম করে। আর হ্যাঁ, কোভিডের বিরুদ্ধে লড়তে শুধু বিজ্ঞান নয়, সঙ্গে চাই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, সংবেদনশীলতা ও দূরদর্শিতা যার উৎস জ্ঞান, বিবেক ও প্রজ্ঞা। •

এণা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রোফেসর ডঃ এণা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান কথা
বিশেষ কোভিড সংখ্যা

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদক
রিণ্টু নাথ

অতিথি সম্পাদক
ডঃ এণা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধান
অমিতেশ ব্যানার্জী

উপদেষ্টামন্ডলী
গৌতম বসু
জিষ্ণু বসু
ভূপতি চক্রবর্তী
মৈত্রী ভট্টাচার্য
শুভব্রত রায়চৌধুরী
সমীর সাহা
সুমিত্রা চৌধুরী

অলঙ্করণ
পিয়ালী ডিজাইন

যোগাযোগের ঠিকানা
বিজ্ঞান প্রসার, এ-৫০, ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া,
সেক্টর ৬২, নয়ডা -২০১ ৩০৯ (উ.প্র.)
ফোন
+৯১-০১২০ ২৪০৪৪৩০
ফ্যাক্স
+৯১-০১২০ ২৪০৪৪৩৭
ইমেল
vigyankatha@vigyanprasar.gov.in
ওয়েবসাইট
www.vigyanprasar.gov.in

"বিজ্ঞান কথা"য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখক ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে বিজ্ঞান প্রসার কোনভাবে দায়বদ্ধ থাকিবে না।

"বিজ্ঞান কথা" য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামুল্যে বিতরিত কোন মুদ্রণমাধ্যমেই বিজ্ঞান প্রসারের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমুলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

বিজ্ঞান প্রসার
এ-৫০, ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া,
সেক্টর ৬২, নয়ডা -২০১ ৩০৯ (উ.প্র.)-এর পক্ষে নকুল পারাশর দ্বারা প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

রোগী-চিকিৎসকের অধিকার ও কর্তব্য এবং কোভিড-১৯

যতীন্দ্র কুমার দাশ

স্বাস্থ্য মানবিক বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং মানবিক বিকাশ হ'ল অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের মৌলিক উপাদান। সুতরাং স্বাস্থ্যের অধিকার আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলির অন্যতম, এবং এর জন্য বহু রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের এই অংশটির গুরুত্ব স্বীকার করেছে। সুতরাং, ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার (ইউডিএইচআর) ২৪ নং অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবার অধিকার এবং অসুস্থতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, বৈধব্য, বার্ধক্য বা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্যান্য কঠিন পরিস্থিতিতে সুরক্ষার অধিকার মঞ্জুর করার কথা বলেছে। ভারতের সংবিধানে স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। ফলস্বরূপ ভারত সরকার ১৯৮৩ সালে তার প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে। এর পাশাপাশি সদ্য আবিষ্কৃত করোনভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত কোভিড-১৯ এর মতো সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধেও ভারতে প্রচুর আইনী বিধান রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯-এর আগে করোনভাইরাস এবং এর সংক্রমিত রোগটি অজানা ছিল যা এখন অতিমারীর রূপ নিয়ে বিশ্বব্যাপী বহু দেশকে প্রভাবিত করেছে। এই নতুন অতিমারীর মোকাবিলা করতে সরকার গত তিন মাস ধরে লকডাউন ঘোষণা করেছে যা ৩০ জুন অবধি কনটেইনমেন্ট জোনগুলিতে কার্যকর থাকবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে আন্ত সংযোগের নির্দেশ দিয়েছে। ২০০৫-এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ৬(২)(আই) এবং ১০(২)(আই) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারত সরকার কোভিড-১৯ মোকাবিলার ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। এই পটভূমিতে বর্তমান প্রবন্ধটিতে অন্যতম মানবাধিকার হিসাবে স্বাস্থ্যের অধিকারের সুযোগ এবং চাহিদা, কোভিড-১৯-এর দিকনির্দেশনা এবং সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ডাক্তার এবং রোগীদের অধিকার-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মানবাধিকার হিসাবে স্বাস্থ্য অধিকার

প্রতিটি রোগীর স্বাস্থ্যের এবং চিকিৎসা সহায়তা পাওয়ার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। এই প্রসঙ্গে প্রযোজ্য অসংখ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নিয়ম ভারতেও স্বাস্থ্যের অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করে। ইউডিএইচআর ছাড়াও ১৯৬৬ সালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (আইসিইএসসিআর)-এর ১২ নং অনুচ্ছেদেও স্বাস্থ্যের অধিকারের অন্যতম বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। আইসিইএসসিআর-এর ১২ নং অনুচ্ছেদটি "শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মান" এর অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। অনুচ্ছেদ ১২(২)-এ এই অধিকার অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় 'পদক্ষেপ' স্পষ্ট করে বলা আছে। সুতরাং, আইসিইএসসিআর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার অন্তর্নিহিত শর্তগুলির সঠিক দিকনির্দেশ করে সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবাকে নিশ্চিত করে। ভারতে, স্বাস্থ্যের অধিকারকে সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম বাংলা ক্ষেত মজদুর সমিতি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শীর্ষক মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট স্বাস্থ্য অধিকারের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছে। এই ক্ষেত্রে আদালত বলেছিল চিকিৎসা সেবা প্রদান করার দায়বধ্যতা থেকেই সরকার হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করে। অনুচ্ছেদ ২১ প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা বলে। মানবজীবন সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী হাসপাতাল এবং সেখানকার কর্মরত চিকিৎসা আধিকারিকদের মানবজীবন সংরক্ষণের জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। আদালত আরও বলে: "সরকারী হাসপাতালে কর্মরত বা কর্মরত নন, উভয়ক্ষেত্রেই প্রত্যেক চিকিৎসকের পেশাদারী দায়বধ্যতা হল জীবন রক্ষার জন্য যথাযথ দক্ষতার সাথে সেবাপ্রদান। কোনও আইন বা রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপই চিকিৎসকের এই দায়বধ্যতা পালনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।"

একইভাবে, বেঙ্গালুরু টার্ফ ক্লাব লিমিটেড বনাম আঞ্চলিক পরিচালক শীর্ষক মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট বলে: "স্বাস্থ্যের অধিকার আমাদের সংবিধানের আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক মানবাধিকার। একজন কর্মীর কাছে চিকিৎসা সুবিধার অধিকার হ'ল তার মৌলিক অধিকার।" আরও, ভিনসেন্ট পানিকুরলঙ্গার বনাম ভারতীয় গণরাজ্য শীর্ষক মামলাতে সুপ্রীম কোর্ট একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদের উল্লেখ করে, "শারীর মাধ্যম খলু ধর্ম সাধনম" (একটি স্বাস্থ্যকর দেহই সমস্ত মানবিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি)। আদালত আরও বলে: "... জনস্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সমাজের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য, কারণ সংবিধান প্রণেতারা যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন সেই সমাজের নির্মাণ জনস্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল।" সুতরাং উন্নত জনস্বাস্থ্য সেবা ভারতের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার, বিশেষভাবে কোভিড-১৯ এর মতো সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে এই সেবা ও সুরক্ষা একান্ত জরুরি।

কোভিড-১৯ মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলী এবং জাতীয় সংক্রমক রোগের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা

কোভিড-১৯ মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলী সারা দেশে অনুসরণ করা উচিত। এটি অনুসারে সর্বজনীন স্থানে, কর্মক্ষেত্রগুলিতে এবং গণপরিবহণে ফেস কভার পরা বাধ্যতামূলক। অবশ্যই সর্বজনীন স্থানে সর্বনিম্ন ৬ ফুট (২ গজ কি দুরী) দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। দোকানগুলিকে গ্রাহকদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং একসাথে ৫জনের বেশি ব্যক্তি যেন দোকানে ভিড় না করেন। বৃহত্তর জনসমাবেশ নিষিদ্ধ, সুতরাং বিবাহ অনুষ্ঠানে অতিথির সংখ্যা ৫০

এর মধ্যে এবং শেষকৃত্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা ২০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা কঠোরভাবে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আইন বা বিধিবিধান অনুসারে এই নির্দেশের লঙ্ঘন জরিমানার সাথে শাস্তিযোগ্য।

পূর্বোক্ত নির্দেশাবলী ছাড়াও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচুর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেগুলি কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্যও প্রযোজ্য। ভারতীয় দন্ডবিধি (১৮৬০)-এর ২৬৯ থেকে ২৭১ নং ধারাগুলি সংক্রামক রোগ দ্বারা জনস্বাস্থ্যকে প্রভাবিতকারী অপরাধ সম্পর্কিত। ২৬৯ ধারায় জীবনধারণের জন্য বিপদজনক রোগের সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনাযুক্ত অযত্নমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে, ২৭০ ধারায় সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনাযুক্ত মারাত্মক আচরণের কথা এবং ২৭১ ধারায় সংক্রমণ রোধে "পৃথকীকরণের নিয়ম" বলা হয়েছে। ধারা ২৬৯ লঙ্ঘনকারী বিপদজনক জীবননাশক রোগের সংক্রমণ ছড়াবার অপরাধে ছয় মাসের মেয়াদী কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারে। তবে, ধারা ২৭০ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিপদজনক জীবননাশক রোগের সংক্রমণ ছড়াবার অপরাধে দুই বছর কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডই হতে পারে। "পৃথকীকরণের বিধি" অমান্য করার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এমনটি করছে তাকে ছয় মাসের মেয়াদে কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। এই বিধানগুলিই ভারতে কোভিড-১৯ এর মাধ্যমে সংক্রমণ রোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

ভারতীয় সংক্রামক ব্যাধি আইন (১৮৬৮)-এ "সাধারণ পতিতা", পতিতালয় রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং পতিতালয়গুলির সকল মহিলা বাসিন্দাদের আবশ্যিক নথিবদ্ধকরণ, স্বাস্থ্যপরীক্ষা, চিকিৎসা এবং নজরদারি করার করার মাধ্যমে ছোঁয়াচে রোগের বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে। আবার, মহামারী আইন (১৮৯৭) তৎকালীন বোম্বে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া বুবোনিক প্লেগের মহামারী মোকাবিলার জন্য চালু করা হয়েছিল। এই আইনটি বিপজ্জনক মহামারীজনিত রোগের বিস্তারকে দ্রুত প্রতিরোধের লক্ষ্যে সাময়িক ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাগ্রহনে কার্যকর। কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু অসংযমী ঘটনা ঘটেছে যা চিকিৎসক সমাজকে হতাশ করেছে। ফলস্বরূপ, কেন্দ্রীয় সরকার মহামারী আইন, ১৮৯৭ সংশোধন করার জন্য মহামারী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ জারি করেছে। এই অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের উপর যে কোনও আক্রমণ একটি বিচারযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে যার সাজা তিন মাস থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ₹৫০,০০০ থেকে ₹৫,০০,০০০ পর্যন্ত জরিমানা।

উপসংহার

সকলের স্বাস্থ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কোভিড-১৯ মোকাবিলার জন্য জাতীয় নির্দেশিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অফিস/কর্মস্থল, দোকান, বাজার এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ/ব্যবসায়ের সময়কে নির্ধারিত করার ক্ষেত্রেও এই নির্দেশনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এটি অনুসারে কর্মক্ষেত্রে থার্মাল স্ক্যানিংয়ের ব্যবস্থা, সমস্ত প্রবেশ এবং প্রস্থানপথে এবং সাধারণ এলাকায় হ্যান্ড ওয়াশ এবং স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ জমায়েত স্থানগুলি ও দরজার হাতলের মত সবসময় মানুষের সংস্পর্শে আসে এমন অংশগুলি সহ পুরো কর্মক্ষেত্রের ঘন ঘন স্যানিটাইজেশন নিশ্চিত করা হবে। এমনকি দুই শিফটের মধ্যবর্তী সময়েও এই জীবাণুনাশক ব্যবস্থাগুলি চালিয়ে যেতে হবে। কর্মস্থলের দায়িত্বে থাকা সমস্ত ব্যক্তি শ্রমিকের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব, শিফটের মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁক, কর্মীদের মধ্যাহ্নভোজনের পর্যায়ক্রমিক বিরতি ইত্যাদি ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। লকডাউন ব্যবস্থা লঙ্ঘনের জন্য অপরাধ ও দণ্ড ২০০৫ সালের বিপর্যয় পরিচালনা আইনের ধারা ৫১ থেকে ৬০ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সরকারী কর্মচারীর দ্বারা যথাযথভাবে প্রবর্তিত আদেশের অমান্য করার ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধি, (১৮৬০) এর ধারা ১৮৮ এর অধীনে দণ্ডনীয় এবং এ ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি (১৯৭৩)-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলিও প্রয়োগ করা হবে। •

লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক।
ইমেল: dasjkdas@rediffmail.com

সামাজিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও কোভিড-১৯

প্রণিতা তরফদার

ব্যাপ্তিশীল সংক্রামক রোগগুলি হ'ল পূর্বে অজানা নতুন উদ্ভূত কিছু রোগ যা সংক্রমণের কারণে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি করে। আজ, নভেল করোনাভাইরাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপ্তিশীল সংক্রামক যা মাত্র ছয় মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে শক্তিশালী দেশগুলিকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক এই অতিমারী সমগ্র মানব জাতিকে ভীত ও হতাশাগ্রস্থ করে তুলেছে, সৃষ্টি করেছে অর্থনৈতিক মন্দা এবং সামাজিক সঙ্কট।

নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ ব্যাপ্তির জন্য অনেক কারণকেই দায়ী করা যায় যার মধ্যে মুখ্য হলো ঘন ঘন আন্তর্জাতিক যাতায়াত, অপ্রতুল নিকাশি ব্যবস্থা সম্পন্ন অত্যন্ত ঘন জনবসতি, বিপুল পরিমাণে খাদ্যের পরিচালনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিবর্তিত পদ্ধতি, মানুষের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ প্রবণতা ও প্রাকৃতিক ভান্ডারের অপচয়। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে একটি হ'ল আপতকালীন ভিত্তিতে কীটাণু সংক্রমণের মোকাবিলায় অপারগ অপ্রতুল জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো।

কোভিড-১৯ রোগটি চীনের উহানের একটি সামুদ্রিক প্রাণী বাজার থেকে উদ্ভূত হয়ে আন্তর্জাতিক যাতায়াতের কারণে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাইরাসটি অত্যন্তরকম ছোঁয়াচে এবং লক্ষণবিহীন সংক্রমিত ও তীব্রভাবে সংক্রমিত রোগীদের থেকে হাঁচি, কাশি, কথা বলা বা স্পর্শের মাধ্যমে অনাক্রম্যতাহীন সংক্রমণপ্রবণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পরে মহামারীর রূপ নেয়। উপরুক্ত কারণগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো ভারতে এই রোগের ব্যাপ্তির সম্ভবনা কত বেশি, বিশেষ করে কলকাতা ও মুম্বাইয়ের মতো জনবহুল শহরগুলিতে যেখানে জনবসতির উল্লেখযোগ্য অংশ বস্তিবাসী এবং জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো যথেষ্ট নয়।

ভাইরাসটির জৈবিক বিশেষত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাব এবং এটির উচ্চ সংক্রামক বৈশিষ্ট্যই এই রোগটিকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। সংক্রমণের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিরা পৃথকীকরণের ভয়ে রোগ পরীক্ষায় নারাজ। যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্রমণ লক্ষণবিহীন বা মৃদু, আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের আচরণ পরিবর্তন প্রচার পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া উচিত।

এই রোগ প্রতিরোধে কিছু রাজ্য তুলনামূলক ভাবে সফল। উচ্চ সাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্যসেবার যথাযথ ব্যবহার এবং একটি শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তারা রোগী চিহ্নিতকরণ, রোগ পরীক্ষা, সংক্রমণের চিকিৎসা এবং সংক্রমিতদের পৃথকীকরণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে পেরেছে।

এই ভাইরাসটির ক্রিয়াকলাপ অবোধ্য, এবং সবল তরুণদেরও সংক্রমণের ফলে মৃত্যু ঘটেছে। পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ও এএসএইচএ কর্মীদের কাজে লাগিয়ে বলিষ্ঠভাবে আচরণ পরিবর্তন প্রচার পদ্ধতিকে কার্যকর করার মাধ্যমেই আমাদের এই রোগ জনিত সমস্যাগুলির থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। এই সামাজিক প্রচার, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে সহানুভূতিপূর্ণ পরিবেশে তাদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় স্থানীয় ক্লাব, মহিলামন্ডল ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবাকে দ্রুত স্বাভাবিক করে তুলতে হবে যাতে স্ট্রোক, হৃদরোগ, এবং ক্যান্সার, মধুমেহ বা উচ্চ রক্তচাপ জাতীয় দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় ভোগা রোগীদের চিকিৎসা অব্যাহত থাকে। প্রসূতির যত্ন, টিকাকরণ, যক্ষা রোগের জন্য ডটস, এইচআইভি/এইডস রোগীদের অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপির মতো নিত্য স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি আবার চালু করতে হবে। আইডিএসপির অধীনে প্রত্যক্ষ ও কার্যকর নজরদারি জোরদার করতে হবে। চিকিৎসা ব্যবস্থার অগ্রগতি ও তালিকাভুক্ত বকেয়া কাজগুলির সুবাস্তবায়ন একান্ত জরুরি। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, তাদের পর্যাপ্ত পিপিই সরবরাহ করাও গুরুত্বপূর্ণ। এই রোগ সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি তথ্য অবাধ ও স্বচ্ছ হওয়া দরকার। এই সমস্ত তথ্য জনসাধারণের এক্তিয়ারে থাকলে গবেষণার মাধ্যমে আরো প্রমান তাদের হাতে আসবে, ফলে মানব জীবনের ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি সহ আরও মানবিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিরোধমূলক এবং সামাজিক ঔষধের প্রয়োগের ভিত্তিতে আমরা এই সঙ্কট মোকাবেলায় সক্ষম হবো। সুতরাং জনসমুদায়ের সাংস্কৃতিক দিকগুলির গভীর উপলব্ধি আমাদের কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সহায়ক হবে যা সম্ভবত দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাথে থাকবে। •

লেখিকা ডায়মন্ডহারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালের সামুদায়িক চিকিৎসা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ইমেল: pranita.taraphdar@gmail.com

কোরোনা ভাইরাস সংক্রমণ: স্বাস্থ্য বিপর্যয় ও তার মোকাবিলার উপায়

মহ: আব্দুল গনি

আজ ৫ই জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনা মনিটরিং কেন্দ্রের বিকাল চারটার সময়ের তথ্য বলছে এখনো পর্যন্ত বিশ্বের ১৮৮টি দেশে সার্স-কোভ-২ (SARS-CoV-2) এর সংক্রমণ হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৬,৫৬,৮২৭ এবং মৃতের সংখ্যা ৩,১৯,৫৭১ জন।

বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা যদি সারণি-১ ভালো করে দেখি তাহলে ৫ই জুন দিনে চারটের সময় ভারতের সংক্রমণের নিরিখে যে সপ্তম স্থান আছে তা কিছুক্ষণের মধ্যে ষষ্ঠ ও আগামী একদিনের মধ্যে পঞ্চম স্থানে উন্নীত হতে যাচ্ছে।

সংক্রমণ বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ভারতে সংক্রমণ বৃদ্ধির হার ব্রাজিলের (৫.১%) ঠিক পরেই (৪.৭%)। ভারতে সংক্রমণের শুরু থেকে ১১০ দিনে মোট সংক্রমণ এক লক্ষে পৌঁছায়। কিন্তু পরবর্তী এক লক্ষ সংক্রমণ ঘটেছে মাত্র ১৪ দিনে।

জুন মাসের প্রথম থেকে ভারতে প্রতিদিন আট-নয় হাজার নতুন সংক্রমণ হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ২৫শে মার্চ থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ লক ডাউনের আওতায় ছিল। অর্থাৎ কোরোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করা যাচ্ছে না।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এন্ড নিউরোসায়েন্স (NIMHANS)-এর নিউরোভাইরোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ ভি রবি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ২০২০ সালের শেষ নাগাদ ভারতের প্রায় অর্ধেক মানুষ কোরোনাভাইরাস আক্রান্ত হবেন। তবে তাঁর আশা, এই রোগীদের প্রায় নব্বই শতাংশ জানতেই পারবে না যে তারা আক্রান্ত। তবে আক্রান্তের ৫-১০ শতাংশের চিকিৎসায় অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হবে। উনি আরো বলেছেন যে এই রোগীদের ৫ শতাংশের জন্য ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন পড়তে পারে। সারা ভারতের প্রেক্ষিতে এই ভেন্টিলেটরের সংখ্যা তিন কোটির অধিক। প্রশ্ন হলো, এই অকল্পনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও দক্ষ মানবসম্পদ কি আমাদের আছে? তাহলে আমরা কোন পথে এই ঘাড়ের 'পরে এসে পড়া স্বাস্থ্য বিপর্যয় মোকাবেলা করবো?

সারণি-১ কোরোনা ভাইরাসের অধিক সংক্রমণ হয়েছে এমন কয়েকটি দেশের কিছু তথ্য

দেশের নাম	৫ই জুন ২০২০ বিকাল ৪:০০ টায় আক্রান্তের সংখ্যা	৫ই জুন ২০২০ বিকাল ৪:০০ টায় মৃতের সংখ্যা	সংক্রমণ বৃদ্ধির বর্তমান শতকরা হার	বর্তমান আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুন হতে প্রয়োজনীয় দিন সংখ্যা	সংক্রমণের শুরু থেকে একলাখে পৌঁছতে কতদিন লেগেছিলো	একলাখ থেকে দুলাখ সংক্রমণ পৌঁছতে কতদিন লেগেছিলো
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৮,৭২,৫৬০	১,০৮,২২১	১.২%	৫৭ দিন	৬৭ দিন	৫ দিন
ব্রাজিল	৬,১৪,৯৪১	৩৪,০২১	৫.১%	১৪ দিন	৬৮ দিন	১১ দিন
রাশিয়া	৪,৪৯,২৫৬	৫,৫২০	২.৪%	৩০ দিন	৯০ দিন	১০ দিন
ইংল্যান্ড	২,৮৩,০৭৯	৩৯,৮৯৭	০.৪%	৮৬ দিন	৭৭ দিন	২০ দিন
স্পেন	২,৪০,৬৬০	২৭,১৩৩	০.২%	২৮৮ দিন	৫৯ দিন	২২ দিন
ইতালি	২,৩৪,০১৩	৩৩,৬৮৯	০.২%	৩৫৮ দিন	৬০ দিন	২৯ দিন
ভারত	২,২৭,২৭৩	৬,৩৬৭	৪.৭%	১৫ দিন	১১০ দিন	১৪ দিন

কোরোনাভাইরাস জনিত স্বাস্থ্য বিপর্যয় মোকাবেলার পরিকল্পনা

ভারতবর্ষের কোরোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাই, গ্রামীণ এলাকায় সংক্রমণ অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে লকডাউনে আটকে থাকা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের আন্তঃরাজ্য চলাচলের জন্য। ফলে আগামী দিনে শহরের সঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় সংক্রমণ দ্রুতগতিতে বাড়বে।

স্বাস্থ্য বিপর্যয় মোকাবেলা তিন পর্যায়ে করা সম্ভব:

(ক) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে পরিকল্পনা

ব্যক্তিগত পর্যায়ে কয়েকটি আচরণগত অভ্যাস করতেই হবে। বিশেষ করে –

(১) একান্ত প্রয়োজন না হলে বাড়ির বাইরে না যাওয়া। দশবছর বা তার কম কিশোরকিশোরী এবং পঁয়ষট্টি বা তার বেশি বয়স্কদের কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বার হাওয়া চলবে না।

(২) বাইরে গেলে উপযুক্ত মুখোশ সবসময়ই লাগাতে হবে। কোনো অজুহাতেই মুখোশ খোলা চলবে না।

(৩) সবসময় অন্যদের সঙ্গে অন্তঃত এক মিটার বা তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

(৪) বাইরের জামাকাপড় ঘরে ঢুকেই স্নানঘরে ছাড়তে হবে। পরে উপযুক্ত সাবানে ভালোকরে ধুতে হবে। অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসগুলো জীবাণুনাশক (sanitiger) দিয়ে খুব ভালো করে মুছে নিতে হবে।

(৫) বাইরে বের হলে মাথা ক্যাপ বা কাপড় দিয়ে ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে। চশমা বা রোদচশমা ব্যবহার করা দরকার। হাতে ঘড়ি, আংটি ব্যবহার না করে ভালো।

(৬) মুখমণ্ডলে, বিশেষ করে নাকের মধ্যে, চোখের কোনায় কিংবা মুখের ভিতরে হাত বা আঙ্গুল দেওয়া চলবে না।

(৭) পকেটে একটা এলকোহলে তৈরী জীবাণুনাশক রাখা দরকার। প্রয়োজনমতো দু হাতে লাগিয়ে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

(৮) এই অভ্যাসগুলো চর্চার জন্য পরিবারে একে অন্যকে উৎসাহিত করতে হবে।

(খ) সামাজিক স্তরে পরিকল্পনা

কোরোনাভাইরাস কেবলমাত্র ইলেক্ট্রন-মাইক্রোস্কোপেই ছবিতে দেখা যায়। অর্থাৎ আমরা অদেখা শত্রুর সঙ্গে লড়ছি। এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তির পরামর্শ অবশ্য পালনীয়। সামাজিক স্তরে আমরা যদি উপযুক্ত যুবদল চিহ্নিত করি, তাহলে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সাধারণ মানুষের উৎসাহপ্রদানকারী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আমাদের সমাজে যারা কোরোনাভাইরাস জনিত রোগকে ভেদবুদ্ধির বশে অন্যভাবে দেখতে চায়, শক্তিশালী সামাজিক পরিকল্পনা সেসব বিভেদই আচরণ রোধে সহায়ক হবে।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে পরিকল্পনা

সকল প্রতিষ্ঠানেরই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। কোরোনাভাইরাস জনিত অতিমারী রোধে অনেকক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা চাহিদাকে পুরো মেটাতে পারে না। এক্ষেত্রে যাঁরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের অতিরিক্ত দায়িত্বশীল হাওয়া দরকার। উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হয়। স্থান, কাল ও পাত্র বিচারে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত বদল এনে সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করা যায়। •

লেখক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ-এর ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
ইমেল: mdabdulgani61@gmail.com

ভারতীয় পেটেন্ট আইনে পেটেন্ট সুরক্ষিত কোভিড-১৯ এর প্রতিষেধক ব্যবহারের অধিকার ও সুযোগ

সবুজ কুমার চৌধুরী

জোনাস সাল্ক ১৯৫৫ সালে পোলিও রোগের প্রতিষেধক আবিস্কার করে সারা বিশ্বকে এই মারণ রোগের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। উনাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন- "এই প্রতিষেধকটির পেটেন্ট কার?" তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন – "এই প্রতিষেধকটির কোন পেটেন্ট নেই" উনি আরো বলেছিলেন – "আপনি কি সূর্যের পেটেন্ট পেতে পারেন?" যখনই কোন একটি রোগ মহামারী অথবা অতিমারীর আকার ধারণ করে ও জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তোলে তখন তার নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে ঔষধ আবিস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ কোন শিল্প-প্রয়োগ সম্পন্ন ও উদ্ভাবনী পদক্ষেপ যুক্ত মৌলিক উদ্ভাবনের জন্য উদ্ভাবককে পেটেন্ট দেওয়া হয়। উদ্ভাবক একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (২০ বছর) জন্য পেটেন্ট পেয়ে থাকেন এবং তার পরিবর্তে তাঁকে তাঁর উদ্ভাবনকে প্রকাশ করতে হয়। পেটেন্ট আসলে সমাজ ও উদ্ভাবকের মধ্যে একটা চুক্তি। ঔষধ, প্রতিষেধক ও এন্টিবায়োটিকের পেটেন্টের দুটো দিক থাকে – একটি অর্থনৈতিক ও আরেকটি নৈতিক। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে পেটেন্টের বিকল্প হিসাবে আমরা কোনো মৌলিক উদ্ভাবনকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করার কথা ভাবতে পারি, কারণ পেটেন্টই মৌলিক উদ্ভাবনকে সম্মান জানানোর একমাত্র উপায় হতে পারে না। TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)-এর মাধ্যমে পেটেন্টের যে সঙ্গতিপূর্ণ (harmonised) নীতি সমগ্র বিশ্ব সহ ভারতেও কার্যকরী হয়েছে, তা ভারত ও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের বহুত্ব মূল্যবোধের (value pluralism) বিরোধী। TRIPS-একটি মেধা সম্পত্তি অধিকার সম্পর্কিত বাণিজ্যিক বিষয়ক বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৫ সালে প্রথম কার্যকর হয়। এই চুক্তি, সদস্য দেশসমূহকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স (compulsory licensing) দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছে। ভারত TRIPS-র অন্যতম সদস্য।

সারা বিশ্বে হাতে গোনা কিছু দেশ বাদ দিলে ১৮৮টি দেশ কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত এই মারণ রোগে সারা বিশ্বে প্রায় ৪ লক্ষ লোকের এবং ভারতেও প্রায় ৭ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীদের বাঁচিয়ে তুলতে। ভারত সহ সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই মারণ রোগের প্রতিষেধক ও ঔষধ উদ্ভাবনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। পেটেন্ট ও ঔষধের জটিল সমীকরণ এখনই আমাদের মনে প্রশ্ন এনে দিচ্ছে – এই কোভিড-১৯র প্রতিষেধক আমাদের মতো গরীব দেশের সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকবে কি না। ভারতীয় পেটেন্ট আইন ১৯৭০-এ compulsory licensing বা বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং বলে একটি অধ্যায় বা ধারা আছে। ভবিষ্যতে কোভিড-১৯র প্রতিষেধক বা ঔষধের উদ্ভাবনটি পেটেন্ট পেলেও ভারত সরকার জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের কাছে তা সাশ্রয়ী ও সুলভ রাখতে পারবে।

বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং-এ পেটেন্ট ব্যবহারকারীর পেটেন্ট মালিকের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, TRIPS-র সদস্য দেশগুলির জন্য তাদের পেটেন্ট আইনে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং এর সংস্থান থাকা আবশ্যক নয়। এই ধারাটি TRIPS দ্বারা স্বীকৃত হলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ভারত ও কানাডা ছাড়া অন্য কোনো দেশের পেটেন্ট আইনে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের-এর কোনো উল্লেখ নেই। এটা ছাড়াও ভারতের পেটেন্ট আইনে voluntary licensing বা স্বেচ্ছামূলক লাইসেন্সিং-এর উল্লেখ আছে – যেখানে পেটেন্ট মালিক তার পেটেন্ট স্বেচ্ছায় আরেকজনকে ব্যবহার করতে দিতে পারেন এবং সে বিপরীত প্রকৌশলের (reverse engineering) মাধ্যমে সেই পেটেন্ট পাওয়া ঔষধের জেনেরিক উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানি কররতে পারে। বহুজাতিক কোম্পানি বেয়ারের (Bayer Corporation) নেক্সাভার (Nexavar) তৈরী করার জন্য ২০১২ সালে ভারতের ন্যাটকো ফার্মাকে (Natco Pharma) প্রথম বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং দেওয়া হয়। এই জীবনদায়ী ঔষধটি লিভার ও কিডনির ক্যান্সারের জন্য ব্যবহার হয়।

> **পেটেন্টের বিকল্প হিসাবে আমরা কোনো মৌলিক উদ্ভাবনকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করার কথা ভাবতে পারি, কারণ পেটেন্টই মৌলিক উদ্ভাবনকে সম্মান জানানোর একমাত্র উপায় হতে পারে না।**

রেমডেসিভির (Remdesivir) বর্তমানে কোভিড-১৯র চিকিৎসার জন্য সারা বিশ্বে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ঔষধ হিসাবে বিবেচিত এবং এটি যথাক্রমে ২০১৬, ২০১৯ ও ২০২০ সালের প্রথম দিকে অনুমোদিত তিনটি ভারতীয় পেটেন্টের বিষয়। এন্টিভাইরাল তৈরিতে বিশেষ দক্ষ আমেরিকান বায়োফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা গিলিয়াড সায়েন্সস, ইনক (Gilead Sciences, Inc.), ২০২০ সালের মে মাসে চারটি ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার সাথে স্বেচ্ছামূলক পেটেন্ট লাইসেন্সিং-এর চুক্তি সাক্ষর করার কথা ঘোষণা করেছে এবং তাদের ১২৭ টি দেশে রেমডেসিভির তৈরী ও বিক্রয় করার অধিকার দিয়েছে।

বিশ্ব মেধা সম্পত্তি সংস্থার (World Intellectual Property Organization) মহাপরিচালক ফ্রান্সিস গ্যারি ২৪শে এপ্রিল, ২০২০ "বর্তমান সময়" নামাঙ্কিত একটি বিবৃতিতে বলেছেন, "এখন মূল নীতিগত চ্যালেঞ্জটি হলো সমস্ত রকম উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা যাতে একটি প্রতিষেধক বা ঔষধ বা চিকিৎসা এবং নিরাময়ের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে পারে, পাশাপাশি এমন উদ্ভাবনেও জোর দেওয়া যা সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করে।" কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবিলার বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation) পেটেন্টের অধিকার, প্রতিষেধক উদ্ভাবন সংক্রান্ত পরীক্ষার তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি স্বেচ্ছামূলক একত্রীভবন (voluntary pool) তৈরির প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

সুতরাং বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং ও স্বেচ্ছামূলক লাইসেন্সিং ভবিষ্যতে ভারতের নাগরিকদের সুরক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করবে যাতে কোভিড-১৯র মতো এক মারণ রোগের কোনো প্রতিষেধক বা ঔষধের ব্যবহার থেকে আমরা বঞ্চিত না হই। আরো আশার কথা এই যে, সমস্ত বিশ্ব সংস্থাগুলোও কোভিড-১৯র উপর কার্যকরী যে কোনো গবেষণালব্ধ ফল ও পেটেন্ট সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার জন্য জোরালো সওয়াল করছে। আশা করা যায়, আগামী দিনে কোভিড-১৯র কোনো প্রতিষেধক বা ঔষধ কোনো মানুষেরই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে না। •

লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।
ইমেল: sabujkchaudhuri@caluniv.ac.in

কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ, প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক

এণা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্স কোভ কে ও কেমন? আবির্ভাবের গতি প্রকৃতি

সার্স কোভ-২ ভাইরাস (SARS COV 2) বা সাংঘাতিক শ্বাস কষ্টের রোগ ঘটায় এমন করোনাভাইরাস-২, চীনের উহানপ্রদেশে যার আবির্ভাব ঘটে, আর ১১ই মার্চ, ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যাকে অতিমারী বলে ঘোষণা করে, সেটি একটি 'বেটা করোনাভাইরাস জেনেরা' অন্তর্ভুক্ত 'করোনাভিরিডি' পরিবারের সদস্য। জীন সিকোয়েন্সে এর পূর্বসূরি মানুষের সার্স কোভ-১-এর সাথে এটির সাদৃশ্য ৭৯% আর বাদুড়ের ও প্যাঙ্গোলিনের বেটা করোনাভাইরাসের সাথে প্রায় ৯৮%।

আকৃতি ও প্রকৃতি

একতন্ত্রীবিশিষ্ট পজিটিভ সেন্স আর এন এ জিনোমটির ২৯৮০০টি নিউক্লিওটাইড বেস আছে যা ২৯টি প্রোটিন তৈরী করে। ১০টি ওপেন রিডিং ফ্রেম এমন কিছু প্রোটিন বানায় যা তার গঠনগত ও পরিকাঠামোবহির্ভূত কিছু আকৃতিগত বৈশিষ্টের অর্থাৎ এর আকার নির্ধারণের প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহপদার্থের মিলমিশের সাথে সাথে এমন কিছু উৎসেচকও বানায় যা এর রেপ্লিকেশন ও ট্রান্সক্রিপশনের কাজে অপরিহার্য ও আর এফ-১ রেপ্লিকেস বানায়। ও আর এফ ২-১০ কাঠামোগত এবং সাহায্যকারী প্রোটিন বানায়। ১৫টি অকাঠামোগত (নন্ স্ট্রাকচারাল) প্রোটিনের ৫নং টি হল 3CLpro (৩-কাইমোট্রিপসিন এর মত প্রোটিয়েস) আর ১২নংটি হল RDRP (আর এন এ নির্ভর আর এন এ পলিমারেস উৎসেচক) যা কিনা ভাইরাসের "জীবনের" (যেহেতু ভাইরাসকে ঠিক জীবিত প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা যায় না তাই জীবন কথাটি এখানে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ) পরিপূরক ও সহায়ক। এ ছাড়া ৮নং ও ১০নং প্রোটিন নন্-স্ট্রাকচারাল প্রোটিন যথাক্রমে প্রাইমেস ও হেলিকেস উৎসেচকের কাজ করে যা ভাইরাসের জননে ও সংশ্লেষন ও প্রতিলিপিকরণের সহায়ক। এন এস পি বা অকাঠামোগত প্রোটিনের মধ্যে এন এস পি (NSP)-৩বি, -৩ই, -৯, -১০, -১৪, -১৫ ও -১৬ ভাইরাসের উপরোক্ত কাজগুলিতে অনিবার্য। এন এস পি-১, -৩সি আর ও আর এফ-৭, হোস্ট মানুষটির সহজাত অনাক্রমক্ষমতা (innate immunity) কে প্রতিহত করে এবং মানুষের শরীরের সহজাত বা অর্জিত-অণুশীলিত (acquired) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে।

সনাক্তকরণে আকৃতির ভূমিকা

এই ভাইরাসটির চেহারা তৈরী চারটি মার্কামারা কাঠামোগত প্রোটিনের সমন্বয়ে – স্পাইক (S -এস), অনভেলপ (E -ই), মেমব্রেন (M -এম) ও নিউক্লিওক্যাপসিড (N -এন্) প্রোটিন। স্পাইকটি কাঁটার মত ভাইরাসটিকে হোস্ট মানুষের টাইপ টু ট্রান্সমেমব্রেন সেরিন প্রোটিয়েসের সাথে আটকে ফেলে আর দু ভাগে ভাগ করে দেয় – এস-১ আর এস-২-এ। এস-১ মানুষের অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টেস উৎসেচককে বাঁধে ও কোষের ভেতর ঢুকে পড়ে। নিউক্লিওক্যাপসিড, অনভেলপ ও মেমব্রেন প্রোটিনের কাজ হল ভাইরাসটির আভ্যন্তরীণ নিউক্লিক অ্যাসিডের কুসুমটিকে অক্ষত রাখা ও হোস্টের কোষে ঢোকার কাজে সহায়তা করা। ভিরিয়ন বা ক্ষুদে ভাইরাসের সংশ্লেষ সম্পূর্ণ হলে তারা আবার নিউক্লিক অ্যাসিড কোরটিকে সযত্নে তাদের শক্তপোক্ত মোড়ক দিয়ে আবৃত করে ফেলে।

উপরীলিখিত এই আকৃতিগত অংশগুলি তাকে চেনার, ও প্রকৃতিগত অংশগুলি তার কাজকর্মের ধরণধারণ জানার ও তাকে পরাস্ত করার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তার মারণক্ষমতা প্রতিরোধ করতে ও তাকে জয় করতে এই তথ্যগুলিরই বিশেষ প্রয়োজন।

বিবর্তনের বিভ্রাট

এই প্রোটিনগুলির কোডনের পরিব্যক্তি (মিউটেশন) ঘটলে ভাইরাসের রূপান্তর ঘটবে বা সেগুলিকে লক্ষ্য হিসাবে নিশানা দাগলে ভাইরাসটিকে শেষ করা সম্ভব হবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে জোর করে একটিমাত্র নিউক্লিওটাইড যা কিনা আবার একটি কোডনের (একটি এমাইনো অ্যাসিড তৈরির ফর্মুলা) প্ল্যানের দরকারী একটি অংশ, তা সেই অন্তর্দৃষ্টি দেয়, যা দিয়ে এই নিউক্লিওটাইডটি ভাইরাসের জীবদ্দশায় কি ভূমিকা পালন করে তা জানা যায়। মনে করা যাক, কোডন হল একটি শব্দ যা দিয়ে প্রোটিনের বানান লেখা যায়। আবার একটি নিউক্লিওটাইড হল সেই শব্দের একটি অক্ষর যাতে ভুলচুক হলে বানান ভুল হবে আর প্রোটিনের স্বরূপ পাল্টে যাবে। সিঙ্গল নিউক্লিওটাইড পলিমর্ফিসমের ফলে ভাইরাসের কাঠামোগত বা অকাঠামোগত প্রোটিন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞানের কৌশল

বিজ্ঞান আরো কেমন করে জানে এর এইসব খুঁটিনাটির সুলুক সন্ধান আর কেমন করেই বা ঘুঁটি সাজায় তাকে প্রতিহত করতে? ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপে, এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফিতে চেহারা ও গঠন বুঝে, ইন্ ভিট্রো মিউটাজেনেসিস করে একেকটা জিনোমিক বানান ও বিভিন্ন অতি উন্নত মলিকিউলার বায়োলজি, ইম্যুনোলজি, কোষের পরীক্ষা নিরীক্ষা বা ইঁদুর বাঁদরের কোষে (মানুষের কোষের সমতুল্য এমন প্রাণীর) ভাইরাস ও তার অংশবিশেষকে প্রয়োগ করে তার গুণবিচারের মাধ্যমে বিজ্ঞান, তার জ্ঞানের ভান্ডার ভরায়। এমনি করেই একদিন ভাইরাসকে পরাজিত করার কৌশল আয়ত্ত করে সে।

পরজীবী ও ধারকের অস্ত্র প্রতিযোগিতা

আর ভাইরাস? সে বুঝি চুপটি করে লক্ষ্মী ছেলের মত বসে থাকে? মোটেই না। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে এই একতন্ত্রী ভাইরাসটি প্রায় প্রতি ১৫ নিউক্লিওটাইডে একটি একটি পরিবর্তন ঘটিয়ে চলে আপন খেয়ালে, যেখানে সেখানে, যখন তখন। তার ফলে কখনো তার পরিকাঠামোগত প্রোটিনে আবার কখনো তার পরিকাঠামো অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী প্রোটিনে (নন্ স্ট্রাকচারাল) পরিবর্তন ঘটিয়ে চলে।

সংক্রমণের গতি প্রকৃতি

ভাইরাস সংক্রমণের কাজটি কিভাবে করে? এখনো অবধি যা জানা গেছে, এ মনুষ্যকোষের অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং উৎসেচকের সাথে বিবর্তনের সাহায্যে এক অপূর্ব মেলবন্ধনের ব্যবস্থা করেছে এক্কেবারে মানিকজোড়ের মত কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সের মাধ্যমে। এক হোস্ট থেকে আরেক হোস্টে অবাধে বিচরণ করে ও এ জগতে দিব্যি বিদ্যমান থেকে তার বাছাই করা দ্বারপথে প্রবেশ করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ঘুঁটি সাজানো

এতক্ষণ আমরা তিনটি অতি প্রয়োজনীয় খবর জানলাম। এক, ভাইরাসটিকে সনাক্তকরণে কোন কোন অংশকে চিহ্নিত করতে হবে। দুই, ভাইরাসটির চলাফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করতে কোন কোন ঘটনা এবং তার কর্মীসংখ্যা জানা দরকার। তিন, ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত মানুষের রোগসৃষ্টিকারী অংশগুলি কি জাতীয় ও কখন কখন তা কার্যকর হয়।

সার্স কোভ-২ ভাইরাসের বিজ্ঞানসম্মত সনাক্তকরণ

একজন মানুষ এই ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কিনা জানার চারটি উপায় জানা আছে। সনাক্তকরণের কাজে এই প্রক্রিয়াগুলিই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান সেগুলির পরিশীলন ও পরিমার্জন করে চলেছে। সেগুলি হল যথাক্রমে:

ক। রিয়েল টাইম রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন: পলিমারেস চেইন রিঅ্যাকশন অর্থাৎ পলিমারেস উৎসেচকের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক লয়ে কতটা এবং ভাইরাসের কোন জিন একজন মানুষের শরীরে আছে তা নির্ধারণ করার অতি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া। মানুষের রক্ত, প্রস্রাব, লালারস, নাক ও কণ্ঠনালী হতে সংগৃহীত নমুনা, কণ্ঠনালীর থেকে টানা রস ইত্যাদিতে ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডের উপস্থিতি সনাক্তকরণের পরীক্ষা করা যায়। অপরিবর্তিত থাকে যাকে কনসার্ভড্ রিজিয়ন বলা হয় (অর্থাৎ এই জীনগুলি সাধারণভাবে অপরিবর্তিতই থাকে) এমন অংশেরই কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স তৈরী করা হয় (অলিগো প্রাইমার) যা কিনা সঠিক রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস উৎসেচকের উপস্থিতিতে চট করে আটকে যাবে শুধু ভাইরাসের আর এন এ তেই আর তা থেকে সংশ্লিষ্ট ডি এন এ বানিয়ে পলিমারেস উৎসেচকের সাহায্যে পাওয়া যাবে পজিটিভ ইতিবাচক সিগন্যাল যে এই নমুনায় সার্স কোভ-২ ভাইরাসটিই আছে। এই পরীক্ষা শুধু যে 'আছে'-'নেই' বার্তাবাহক তা নয়, ভাইরাল লোড কতটা বা কতগুলি ভাইরাসের জীন কপি বর্তমান অর্থাৎ "জীবন্ত" বা সক্ষম ভাইরাস কতগুলি তাও জানা যায়। কোভিড ১৯-বাহী ভাইরাস সনাক্তকরণে বাছা হয় এর S, E, M ও N প্রোটিনের কোনো একটিকে। এই কাঠামোগত প্রোটিনের কোনো

একটিকে বাছার কারণ এরাই ভাইরাসের আকার, প্রকার ও আকৃতি র্নিধারণ করে ও মোটামুটি সংরক্ষিত থাকে। সঠিক প্রোব এই পরীক্ষার সাফল্যের নির্ণায়ক। ট্যাকম্যান নামক পরীক্ষার সাহায্যেও এটি করা যায়। ছোট ছোট প্রাইমার বা পরিপূরক নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স নক্সা মেনে তাতে একেক রকমের রং লাগানো হয়। এক বা দুই বা চারটি প্রোব বা প্রাইমার তৈরী করা হয়। আরটিপিসিআর যন্ত্রে সঠিক তাপমাত্রায় যথাযথ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যদি পসিটিভ প্রোডাক্ট তৈরী হয় তো, বলা যায় বাস্তবিকই মানুষটি সংক্রামিত ও তার মধ্যে অমুক পরিমাণ ভাইরাস বর্তমান। এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার পরীক্ষা ব্যবস্থা যদি না আপনা আপনি মিউটেশনের ফলে করেভাইরাসটি তার কোনো কাঠামোগত প্রোটিন জিনের রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলে আর তৈরী করা প্রাইমারি প্রোবটি অকেজো হয়ে যায়। কোনো একটি কোডন পাল্টে গেলে 'কিট'টি সম্পূর্ণ অনুপযোগী প্রতিপন্ন হবে ও পরীক্ষার ফলাফল ভুল হবে। তাই সর্বাগ্রে দরকার এই দেশের আক্রান্তদের নমুনায় বর্তমান ভাইরাসদের অনেক অনেক জীন সিকোয়েন্সের তথ্য আর সেই মতই প্রাইমার তৈরী করা। বিদেশি মানেই উন্নত এমন ধারণাটা এক্ষেত্রে নিরর্থক ও আমদানী করা বিদেশী 'কিট' অন্য দেশে অর্থহীন।

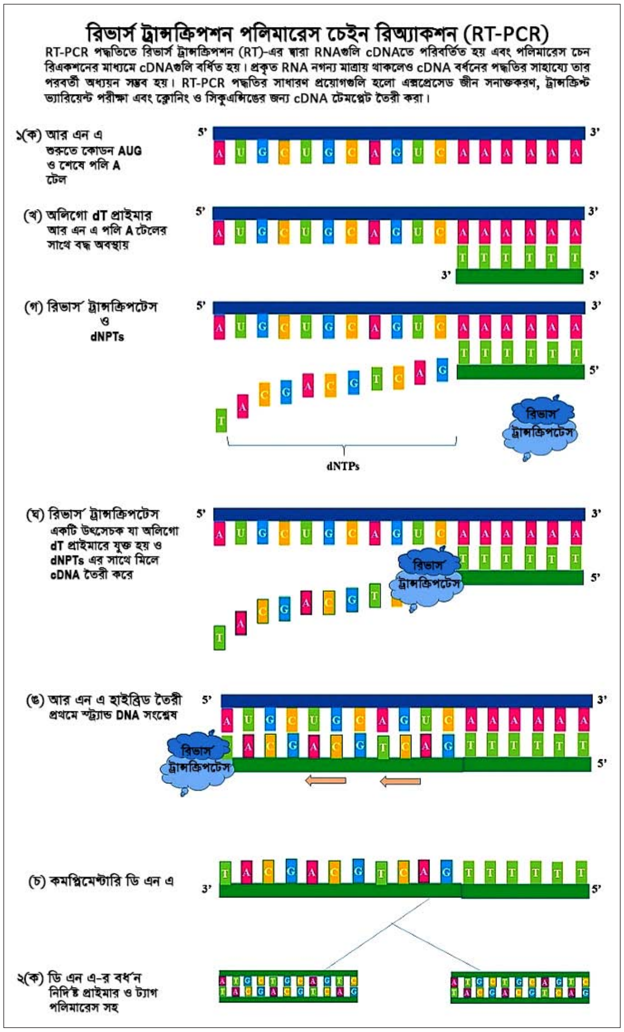

রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন পলিমারেস চেইন রিঅ্যাকশন

খ। এলাইসা বা এনজাইম লিঙ্কড্ ইম্যুনো সরবেন্ট পরীক্ষা: এর মাধ্যমে রোগীর রক্তে ভাইরাস-বিরোধী অ্যান্টিবডিকে সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া হয়। কিন্তু এই পরীক্ষা ততক্ষণ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না মানুষের শরীর সেই অ্যান্টিবডিকে তৈরী করে দেখিয়ে দেয়। ভাইরাস-বিরোধী অ্যান্টিবডি পাওয়া গেলে তা রিকম্বিন্যান্ট ডি এন এ টেকলজির দ্বারা ব্যাক্টিরিয়া মধ্যে দ্রুত বাড়িয়ে নিয়ে কোভিড পরীক্ষায় সরঞ্জাম তৈরি করা হয়। কিন্তু এর আগের আলোচনায় যে দ্রুতগামী অভিব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে, তার কারণে ভাইরাসের রূপান্তরিত সেরোটাইপ অন্যরকম হয়ে যাবে এবং এই রাপিড টেস্টটিও সফল হবে না। তাই এক্ষেত্রেও প্রচুর সংখ্যক রোগীর টিস্যুর নমুনায় কোভিডের সম্ভাব্য জেনেটিক ও সেরোটাইপের আলাদা ও পরিবর্তিত যে রূপগুলি বিদ্যমান, তা খতিয়ে দেখা আবশ্যক।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বহুরূপী এই ভাইরাসের সনাক্তকরণের এই দুই প্রক্রিয়াই বিফল হবে ও ভুল ফলাফল দেবে যা এমতাবস্থায় অতিমাত্রায় বিপজ্জনক। ভুল পসিটিভ মানে হেনস্থার শিকার হওয়া এবং শুধু একা নয়, যাদের যাদের সঙ্গে কনট্যাক্ট হয়েছে তাদের সবাইকে নিয়ে অহেতুক টানাহেঁচড়া। ভুল নেগেটিভ হলে আপনি আক্রান্ত ও ভবিষ্যতের রোগী কিন্তু তা নির্ণয় হল না আর আপনি যথেচ্ছ রোগ সংক্রমণ করে বেড়ালেন। এই দুই ভুলের মাশুল দিতে হবে সারা সমাজকে।

গ। হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং: সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত ভাইরাল জিনোমের সিকোয়েন্স করা। 'ক' ও 'খ'য়ে উল্লিখিত এই পরীক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ ও অত্যন্ত উন্নত ও দামী সিকোয়েন্স যন্ত্রের মুখাপেক্ষি। এটি একমাত্র পরীক্ষা যাতে ভুল হওয়ার অবকাশ প্রায় নেই কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্ট বেশ খরচের আর দামী এই যন্ত্রটিও মাঠে ঘাটে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ঘ। পেপার বেসড্ প্রযুক্তি: এর নাম এফ্ এন্ ক্যাস্ ৯ এডিটর লিঙ্কড্ য়্যুনিফর্ম ডিটেকশন অ্যাসে বা প্রত্যেক শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে ছোট করে 'ফেলুদা'। এই পরীক্ষায় আর এন এ টিকে প্রথমে একটি কম্প্লিমেন্টরি ডি এন এ তে পর্যবসিত করা হয় এবং পরবর্তীতে পি সি আরের মাধ্যমে ক্রিস্টাল ক্যাস ৯ প্রোটিনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয় যা ভাইরাসের টুকরোটিকে নির্ভূলভাবে চিনে বের করতে পারে।

এই চারটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষাই শত্রু ভাইরাস সনাক্তকরণের হাতিয়ার। 'খ' পরীক্ষা একজন মানুষের নমুনা একেকটি রিঅ্যাকসন পাত্রে নিয়ে করা হয় অথবা অনেকের একত্রিত নমুনা (পুলড্) জমা করে করা হয় যাতে দ্রুত সনাক্তকরণ সম্ভব। মনে করুন ৭জন মানুষের রক্তের সেরামিক একসাথে পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এলো। তার মানে কেউই এদের মধ্যে সংক্রামিত নন। যদি পজিটিভ হয় তখন আবার একেক জনের নমুনা আলাদা করে পরীক্ষা হবে নচেৎ নয়। অনেকটা সময় ও খরচা বাঁচে এভাবে। আবার 'ক', 'গ' ও 'ঘ' পরীক্ষাগুলি এক সঙ্গে ও দ্রুতবেগে অনেকগুলি নমুনা নিয়ে করা যায়, যাকে বলে হাই থ্রুপুট টেস্টিং।

জনজীবনে এই পরীক্ষার তাৎপর্য এই যে যেগুলি পয়েন্ট অফ কেয়ার হবে, বা যেখানে নমুনা সংগ্রহ করা হবে সেখানেই তাৎক্ষণিক পরীক্ষার ফলাফল বলতে পারবে। মানুষটিকে পাশে বসিয়ে তার নমুনা পরীক্ষা ও প্রায় সাথে সাথে ফলাফল জানানো ও সেই মত বিধিব্যবস্থা করা, এটাই এখন সরকারের ও বিজ্ঞানীমহলে প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া দরকার।

শত্রুর বিনাশের পথ

সার্স কোভ-২ ভাইরাস তার পছন্দসই প্রবেশ পথটি বেছেছে জব্বর। একটি উৎসেচক। নাম অ্যাঞ্জিওটেন্সিন কনভার্টিং এনজাইম। ধাম প্রায় সমস্ত রক্তনির্বাহী শিরা ও ধমনী কোষ। ভাইরাসটি যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে এত চমৎকার তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে সেগুলি যথাক্রমে সার্স কোভ-১ ভাইরাসের Y৪৪২, L৪৭২, N৪৭৯, D৪৮০, T৪৮৭, ও Y৪৯১১ অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবর্তে L৪১৫, F৪৮৬, Q৪৯৩, S৪৯৪, N৫০১, ও Y৫০৫। এই মোক্ষম প্যাঁচটি কষে ২নং ভাইরাস তার পূর্বসূরি ১নংটিকে অবলীলায় ছাপিয়ে গেছে তার অনায়াস আক্রমণ ক্ষমতায়। এই এয়েস্ টু আর ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিয়েস সেরিন টু এর সাহচর্যে ভাইরাস ঢুকে পড়ে কোষে। শ্লেষ্মা ঝিল্লি ভাইরাসটির সংক্রমণের পথ হওয়ায় মানুষের নাসারন্ধ্র বা যে কোনো মিক্স মেমব্রেনের মাধ্যমে, নিঃশ্বাস বা স্পর্শে সংক্রমণ ঘটে। ভাইরাস সহজেই তার বাহিরীক স্নেহপদার্থের সাহায্যে মানুষের কোষের স্নেহপদার্থের কোষঝিল্লি সাথে মিশে যায় ও সেই বাধা অতিক্রম করে ফেলে। এরপর সে কোষের অভ্যন্তরে প্রতিলিপিকরণের ও সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ায় নিবৃত্ত হয়।

কোভিড-১৯ রোগের স্বরূপ

কোভিড রোগীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ফুসফুসের অতিরিক্ত ক্ষতি, সাইটোকাইন ঝড় ইত্যাদি বহু উপসর্গের লক্ষণ দেখা দেয়। উপশমকারী যন্ত্রের সাহায্য একজন মুমূর্ষু রোগীর কষ্ট লঘব করা মাত্র সম্ভব আর বাকি কাজ অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ করা বা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার কাজটা পুরোটাই রোগীর অনাক্রম্যতা করে।

কোভিড ১৯এর প্রতিরোধক

এবার আসি এই মারণ ভাইরাসটির মারক রূপকে সংহার করতে যে তথ্যগুলো আমাদের

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য...

অতিমারি থেকে অন্য-স্বাভাবিকতা – শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য ও যত্নের প্রসঙ্গ

মৃণাল মুখার্জী

সায়ন্তনি রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে আছে মুখ গোমড়া করে। মা যতবার জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে, সে নিরুত্তরই থাকে। মায়েরও মন ভাল নেই। এক-দু-কথাতেই রাগ হয়ে যায়। চারপাশে কিছুই যে ঠিক নেই। ক্লাস এইট-এ ওঠা অবধি আজ পর্যন্ত স্কুল যাওয়া হলনা। নতুন বইয়ের গন্ধও আজ অবধি শোঁকা হল না, নতুন ক্লাসরুম, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, গল্প সেতো দূর অস্ত। তবু ভাল, মা রাগ করলে ঠাকুমা এসে সামলায় সায়ন্তনিকে। ও-দিকে শাশ্বত পড়েছে আরেক সমস্যায়। একাদশ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা অর্ধেক হয়ে বন্ধ হয়ে আছে। মে-মাস পেরোতে চলল, ও এখন একাদশ না দ্বাদশ শ্রেণী, সেটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। শুনছে সকলকেই দ্বাদশ শ্রেনীতে 'প্রোমোশন' দেওয়া হবে। কিন্ত ওর মন মানছে না, শাশ্বত চেয়েছিল জয়েন্ট এন্ট্রাস এর আগে একাদশেই অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যায় নিজেকে একটু পরখ করে নিতে। বাড়িতে এমনিতেই বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া লেগেই আছে।এই লকডাউনের দীর্ঘ সময় যেন ওদের সংঘাত আরও বেড়ে গেছে। দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে ও এখন অনেকটা একা হয়ে গেছে। শাশ্বতর কিচ্ছু ভালো লাগে না... মনে হয় জীবনটা শেষ করে ফেলে।

মে মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১২২০,২৪২১৯১ যাদের স্কুল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ এবং যাদের স্কুল আংশিকভাবে বন্ধ সেই সংখ্যা হল ৮৪১৮৪১৭৬।

১৫৬ টি দেশে সম্পূর্ণভাবে এবং ৯ টি দেশে আংশিকভাবে স্কুল বন্ধ আছে, যার প্রধান কারণ নভেল-করোনা সংক্রমণ। ভারতে 'লকডাউন'-এর কারনে বস্তুত মার্চের ১৬-১৭ তারিখ থেকে সারাদেশে সব শিশু-কিশোর গৃহবন্দি। এপ্রিল মাসে ল্যান্সেট মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে ব্রুক্স ও সহ-গবেষকরা জানিয়েছেন যে এই আবশ্যিক সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় মানুষের মধ্যে ক্রোধ, সন্দিগ্ধতা, উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে, এছাড়া হতে পারে প্রবল ট্রমাজনিত স্ট্রেস। অতিমারির অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মানুষ এইসময় আচরনগত সামঞ্জাস্যস্থাপন ও আবেগ জনিত নিয়ন্ত্রণহীনতায় ভোগে এবং আত্মরক্ষা মুলক প্রতিক্রিয়া দেখায়। এপ্রিলে প্রকাশিত "মেন্টাল হেলথ ইন দি টাইমস অফ প্যান্ডেমিক" – মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশমূলক নিবন্ধে ব্যাঙ্গালোরের নিমহানস শিশু, কিশোর ও বয়স্ক মানুষদেরকে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে।

আজকালতো ছোটরাও গণমাধ্যম ও সামাজিক-মাধ্যমের নিবিড় সংস্পর্শে থাকে। নাতাশারও স্কুল বন্ধ, ও শুনেছে যে চিন এবং ফ্রান্সে স্কুল খোলার পরও নাকি আবার বন্ধ করে দিতে হয়েছে এই নভেল-করোনা রোগের কারণে। এদিকে নাতাশার দাদা আয়ান মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে, এতবার করে হাত ধুচ্ছে যে বাবা, ডাক্তার আঙ্কেলকে ফোন করতে বাধ্য হয়েছে। বাবা মাকে বলছিল – এটা নাকি 'ওবসেসিভ কম্পালশিভ ডিসঅর্ডার'। অতিমারির আবশ্যিক সামাজিক বিচ্ছিন্নতা শিশু-কিশোরদের কাছ থেকে শুধু স্বাভাবিক জীবন-ই কেড়ে নিয়েছে তাই-নয়, তাদের করে তুলেছে ভীত-সন্ত্রস্ত। ভারতের নিমহানস এর ডিপার্টমেন্ট অফ চাইল্ড এন্ড আডোলেসেন্ট সাইক্রিয়াট্রিক এর গবেষক প্রীতি জ্যকব ও তার সহ-গবেষকরা জানিয়েছেন যে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ভয়, উদ্বিগ্নতা, ক্ষুদামন্দ্য, ঘুমের সমস্যা থেকে তারা গভীর আবসাদগ্রস্থ হয়ে পরতে পারে। শিশু-কিশোরদের নিজেদের মৃত্যুভয় বা নিকটজনের মৃত্যুভয়ও তাদের স্বাভাবিক মানসিক গঠনকে বিপন্ন করতে পারে। দীর্ঘকালীন এই লকডাউন এ তারা স্কুলের পড়াশুনো থেকেই শুধু বঞ্চিত হচ্ছে তা নয়,

> **ব্যাঙ্গালোরের নিমহানস শিশু, কিশোর ও বয়স্ক মানুষদেরকে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে।**

উপরন্তু স্কুলের পরিবেশ, সহপাঠীদেরই সাহচর্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্যের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। স্কুলের পরিবেশের বিকল্প বাড়িতে যোগান দেওয়াটা সত্যি খুব চ্যালেঞ্জের।

ফ্রান্স এর মহিলা কমিশন ইতিমধ্যে লকডাউনে গার্হস্থ্য হিংসার ও তার কারনে শিশু ও কিশোরদের মানসিক উদ্বিগ্নতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারতেও ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণায় একই রকমের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ইউনিসেফ এর সামাজিক নীতি সংক্রান্ত গবেষক আলেসসান্ড্রা ও তার সহগবেষকরা তাদের গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন গৃহবন্দি জনিত সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাবে সারা পৃথিবী জুরে গ্রাহস্থ হিংসা বিপদজনক আকার ধারন করেছে, যার প্রতিকারে অনতিবিলম্বে রাষ্ট্র সমূহকে নীতিগত বাবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নিতে হাবে। এবং জরুরি বাবস্থা হিসেব এ গ্রাহস্থ হিংসার আশু উদ্রেককারি প্রভাবকগুলিকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। সমাজ বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে এই অতিমারী লিঙ্গ বৈসম্যকে আরও তীব্র করবে, যা কৈশোরের মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্কটকে বাড়িয়ে তুলবে। WHO গত ১৮ ই মার্চ, "মেন্টাল হেলথ এন্ড সাইকো-সোশ্যাল কন্সিডারেশন ডিউরিং দি কোভিড-১৯ আউটব্রেক" শীর্ষক নিবন্ধে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের পরামর্শে শিশুদের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদে জানিয়েছে শিশুদের দুঃখ, ভয় ইতাদি অনুভূতিগুলিকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে দেওয়ার আবশ্যক এবং যতদুর সম্ভব তদের বাবা-মা বা নিকটজনের কাছে থাকবার সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। এই গভীর দীর্ঘ মানসিক পীড়নের সময় শিশুরা জেদি হয়ে উঠতে পারে এবং মা-বাবার সঙ্গ বেশি করে চাইতে পারে। এই অতিমারীর সময়ে শুধু যে বয়স্ক মানুষদেরই ঘুমের সমস্যা হচ্ছে তাই নয়, কিশোর-কিশোরীরাও অনিদ্রায় ভুগছে, যা তাদের স্বাভাবিক মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যকে বিঘ্নিত করছে, যার ফলে অনাক্রামনতারও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে কিশোর-কিশোরীরা এমনিতেই মানসিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, এবং কারো কারো মধ্যে নিজের প্রতি ঔদাসিন্য, কেউ কেউ আবার অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করতে পারে এবং নিজেকে মূল্যহীন ভেবে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধিকে উপেক্ষা করতে পারে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা। WHO, UNICEF, USAID তাদের যৌথ পরামর্শ 'কোভিড-১৯ প্যারেন্টিং'-এ জানিয়েছে যে শিশু-কিশোরদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে না গিয়ে উপযুক্ত ভঙ্গিতে তাদের বয়স আনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সহযোগে আলোচনা করা দরকার। শিশু-কিশোরদের সৃষ্টিশীলতাকে সক্রিয় রাখা একান্ত জরুরি, যা তাদের নিজেদেরকে প্রকাশ করতে ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংযোগ গড়ে তুলতে সাহাজ্য করবে। ছবি আঁকা, গান-নাচ, আরও নানারকমের কাজে তাদের ব্যস্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি নিয়ে তাদের সাথে সতর্কতার সঙ্গে আলোচনা করা এবং কৈশোরের ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণে রাখা এবং প্রয়োজনে তাদের মানসিক সমস্যায় চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। ইলেক্ট্রনিক স্ক্রিনকে কিশোর-কিশোরীদের জীবন থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে খেলাধুলায় যুক্ত রাখতে পারলে সবচেয়ে ভাল।

মার্চ মাসে সিঙ্গাপুর এর প্রকাশিত একটি গবেষণাতে দেখা যায় যে শিশু-কিশোররা তাদের পড়াশুনো নিয়েও যথেষ্ট মানসিক চাপের মধ্যে থাকছে। বিশেষ করে কৈশোরে উপস্থিত

ছাত্র-ছাত্রীরা কোভিড-১৯ আউটব্রেক তাদের পড়াশুনোকে প্রভাবিত করবে বলে মনে করছে, যা তাদের মানসিক পীড়নের একটি কারণ। এক্ষেত্রে পরিবারের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপৎকালীন দূরশিক্ষার মাধ্যমে যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সংকটের সময়ে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে জুড়ে আছেন, তাঁদের সচেতনতা ও দক্ষতার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সেলিং এর দায়িত্ব নিতে হবে। বিশেষকরে যে সমস্ত বয়সসন্ধিকালের ছাত্র-ছাত্রীরা অটিসম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার-এর মত রোগে আক্রান্ত তাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন ছন্দ ব্যাহত হলে তারা মানসিক ভাবে আরো বিপন্নতা বোধ করতে পারে। তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। IASC, যা UNICEF, WHO এবং IFRC র যৌথ তত্ত্বাবধানে কাজ করে, ২০২০ র মার্চে 'ইন্টারিম গাইডেন্স ফর কোভিড-১৯ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল' শিরোনামে যে পরামর্শ নির্দেশিকা প্রকাশ করে তাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক সাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধু শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতার পাঠ দেবেন তাইই নয়, উপরন্ত শিক্ষার্থীরা যাতে সহপাঠীদের পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে, সে বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়ও নিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আঞ্চলিক স্তরে যে মানবসম্পদ আছে তা নিয়েই বিশেষ করে যারা অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক এবং অন্যভাবে-সক্ষম সেই সকল শিক্ষার্থীদের বাড়তি গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে পরিচর্যা করতে হবে।

সার্স রোগের প্রকোপের সময় লকডাউন ও সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণের সময় বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ যেমন স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীদের ওপর মানসিক প্রভাব নিয়ে কিছু গবেষণা হলেও বিশেষ করে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ওপর প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সার্স রোগের তুলনায় কোভিডের প্রভাব অনেক গভীর ও ব্যাপ্ত। এক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর অতিমারী ও গৃহবন্দিকালীন দশার প্রভাব দীর্ঘকালীন সময় ধরে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া দরকার। সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও স্বাস্থ্যনীতি গড়ে তুলেই এর সমাধান সম্ভব।

স্কুল আবার খুলবে, শিশু-কিশোর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যাবে। হয়ত অনেকদিন তাদের মেনে চলতে হবে শারীরিক দূরত্বের নিয়মবিধি। বদলে যাবে আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির প্রাত্যহিকতা। এ এক অন্য-স্বাভাবিকতা। সকলকেই এগোতে হবে সাবধান ভাঙ্গাচোরার ভেতর দিয়ে। এই চড়াই-উতরাই, টানাপোড়েনের সময় সবচেয়ে জরুরি বোধহয় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নের প্রসঙ্গ। আশা করা যায় যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানসন্মত সুচিন্তন ও যৌথ দায়বদ্ধতার মাধ্যমে আমারা ইতিহাসের এই সঙ্কটকালকে অতিক্রম করতে পারবো। •

লেখক ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টিচারস' ট্রেনিং, এডুকেশন প্ল্যানিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কোলকাতার অধ্যাপক। ইমেল: dr.mmrinal@gmail.com

...সপ্তম পৃষ্ঠার পর

ইতিমধ্যে জানা হয়েছে তা ব্যবহার করে তাকে নিধন করার উপায় নির্ধারণে। আগেই বলেছি ভাইরাসের কাঠামোগত ও কাঠামো-বহির্ভূত ব্যবহারিক প্রোটিনগুলির মধ্যে ১৫টি বিশেষ করে তার জীবদ্দশায় বিভিন্ন কার্যকারণ সম্বন্ধীয় ও ক্রিয়াকলাপ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত। এই ১৫টির মধ্যে ১ ও ৩ নং পাওয়া এর পূর্বসূরি সার্স কোভ ভাইরাসের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। আরেকটি ইউবিকুইটিনেশানের বিরোধী উৎসেচক ও প্রোটিন ভাঙার উৎসেচক যা আগের কিছু অনুচ্ছেদে নির্দেশ করেছি। অতএব, লক্ষ্যভেদ করতে গেলে যে লক্ষ্যবিন্দুগুলি ভাইরাস সংহারের জন্য স্থির করা গেল তা হল-

ক। ভাইরাসের প্রোটিন

খ। হোস্ট বা ধারকের প্রোটিন

যা কিনা কোভিড রোগ সৃষ্টিতে কার্যকর এবং আমাদের ভাইরাস শিকারের নির্ভুল চাঁদমারি।

আগে বলেছি ভাইরাস সনাক্তকরণে কোন অংশগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। এবার বলি ওষুধের সন্ধান ও নির্মানের জন্য যেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের কথা। ভাইরাসের উৎসেচকগুলি (3CLPro, PLPro, স্পাইক প্রোটিন) ও ACE2 আর TMPRSS2, যা পোস্টার প্রোটিন, এগুলি ওষুধের নিশানা হিসেবে এখনো অবধি আশাপ্রদ।

আজ অবধি তেমনভাবে নিশ্চিত কোনো ভাইরাস সংহারকারী ওষুধ খুঁজে পাওয়া যায় নি বা নতুন করে তৈরী হয় নি। তবে ইতিমধ্যে তৈরী হওয়া ও ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রশনের অনুমোদন পাওয়া ওষুধ যা অন্য ভাইরাস-জনিত রোগের ওষুধ যেমন অ্যাভিফাভির, রেমডেসিভির, ডানপ্রেভির, রিটোনাভির, বা ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, বা ব্যাক্টিরিয়াজনিত রোগের ওষুধ অ্যাজিথ্রোমাইসিন, আই ভি আই জি (ইন্ট্রাভেনাস ইম্যুনোগ্লোবিউলিন) এবং নানাবিধ অনাক্রম্যতার পরিপূরক (অনাক্রম্যতাবর্ধক কথাটি বিভ্রান্তিকর ও সদর্থে সঠিক নয়) যেমন আয়ুর্বেদিক ভেষজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরী এমন ওষধি প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকরিতা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথা সাধারণ মহলে গুঞ্জিত হচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে মূলতঃ উপসমক যত্ন একজন রোগীর নিজের সেরে ওঠার ক্ষমতার পাশে পাশে ব্যবহার করাই আপাততঃ একমাত্র প্রোটোকল।

কোভিড-১৯-এর প্রতিষেধক

এ ছাড়া রোগটিকে আটকাতে টীকা বা প্রতিরোধের খোঁজ চলছে। ভাইরাসের সম্পূর্ণ অবয়ব বা ছোঁয়াচ সৃষ্টিকারী অংশটি বাদ দিয়ে বাকিটা অ্যান্টিজের রূপে প্রয়োগ করা বা ডি এন এ টীকা বা আংশিক ভাইরাস আরেকটি আত্মীয় ভাইরাস জুড়ে টীকা প্রস্তুত করা হয়। যেমন মডার্ন কোম্পানির 'এম আর এন এ ১২৭৩' যা একটি কৃত্রিম আর এন এ, মানুষের শরীরের কোষগুলিকে বুঝিয়ে বাজিয়ে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরী করাবে বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চ্যাডক্স' যা একটি সার্স কোভ-২ এর স্পাইক প্রোটিনের সিকোয়েন্স বহনকারী অ্যাডিনোভাইরাস বাহক বা সিনোভ্যাকের 'কোরোভ্যাক' যা একটি নিষ্ক্রিয় সার্স কোভ-২ নির্মিত

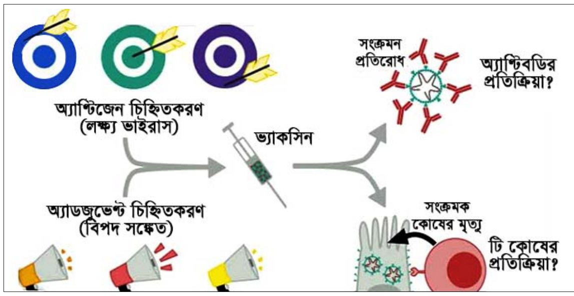

ভ্যাকসিনের কর্মপদ্ধতি

তবে মনে রাখতে হবে মূলতঃ উপসমক যত্ন একজন রোগীর নিজের সেরে ওঠার ক্ষমতার পাশে পাশে ব্যবহার করাই আপাততঃ একমাত্র প্রোটোকল।

টীকা যথাক্রমে দ্বিতীয়, প্রথম ও তৃতীয় ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিশ্চয় করা দরকার যে টীকাকরণে অ্যান্টবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহান্সমেন্ট বা অন্য কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা বিষক্রিয়া বা অনভিপ্রেত শারীরিক প্রতিক্রিয়া অবাঞ্ছনীয় কিন্তু তা আরো হল কিনা তা দেখার জন্য টীকা পাওয়া মানুষটির রক্তরসের অন্ততঃ ৬-১৪ মাস পরীক্ষা করা দরকার। টীকার প্রভাব স্বল্পস্থায়ী না দীর্ঘস্থায়ী এটাও জানা দরকার। পরীক্ষার জন্য ভাইরাসটির জনসংখ্যায় বেশ ভালোভাবে থাকাটাও দরকার। অনাক্রম্যতার পরিপূরক ওষধি কিন্তু সুষম আহার, সুষ্ঠু বিহার ও পর্যাপ্ত নিদ্রা ব্যতিরেকে নয়। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাও ভাইরাসকে দূরে সরিয়ে রাখার উপায়।

পরিশেষে

মনে রাখতে হবে যে পৃথিবী আসলে একটি ভাইরাসের গ্রহ। সৃষ্টির আদিতে তারা ছিল ও মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তারা থাকবে। অতএব তাদের সাথে তাদের বশ্যতা স্বীকার করেই মানুষকে কোনো রকমে প্রাণধারণ করতে হবে। দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ, কলেরা, টাইফয়েড, এইচ আই ভি, বসন্তরোগ, পোলিও এরকম আরো অনেক ভাইরাস পঙ্গু করে দিত মানুষের সভ্যতারকে। ভয়ঙ্কর মহামারী দেখা দিয়েছে অতীতে। আজ তারা নিয়ন্ত্রিত বা অবলুপ্ত। নিপা, জিকা, নানা প্রকার এইচ ওয়ান এন ওয়ান ফ্লু ভাইরাস এখনো মাথা চাড়া দেয়।

কখনো মানুষ জেতে, কখনো ভাইরাস। তাই তাদের সাথে আপোস করে বা দ্বন্দ্বকেই সঙ্গী করে থাকতে হবে আমাদের। আশা রাখি বিবর্তনের নিয়ম মেনেই সার্স কোভ-২ ভাইরাসও শক্তিক্ষয় করবে। ইতিমধ্যে সাময়িকভাবে হলেও মানুষের দম্ভচূর্ণ হোক, অন্ততঃ প্রাণের ভয়েও উচ্ছৃঙ্খল সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ হোক। তবে এতদসত্ত্বেও মানুষ নামক সর্বশক্তিধর পরজীবীটি এখনো অনেকদিন পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াবে বলেই ঠাহর হয়। •

লেখিকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। ইমেল: erb@caluniv.ac.in

বোকা বাক্সে সহজ পাঠ

শুভা দাশ মল্লিক

জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলে জীবন্ত ক্লাস রুমের অভিজ্ঞতা

কোভিড জনিত গৃহবন্দী অবস্থা আমাদের জীবন শৈলীতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। আমাদের জীবন এখন বাহুল্য বর্জিত, পরিচ্ছন্ন। আমরা গৃহকর্মে স্বাবলম্বী এবং যন্ত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনে পারদর্শী। তবে সবথেকে বেশী পরিবর্তন বোধহয় এসেছে শিক্ষা জগতে। পড়ুয়াদের পড়াশুনো অব্যহত রাখার জন্য সরকারী, বেসরকারী, যৌথ, একক বহু প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে এবং কিছু প্রচেষ্টা এতটাই সফল হয়েছে যে এগুলি নব্য সাধারণ পরিস্থিতির অঙ্গ হয়ে যাবার দাবী রাখতে পারে। এইরকমই একটি প্রয়াস 'টিভির পর্দায় ক্লাসরুম'।

বুধবার, ৭ই এপ্রিল, ২০২০। সময় দুপুর ৩টে। একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে করোনা জড়িত বাদানুবাদ বা রাজনৈতিক কচকচানির পরিবর্তে দেখা গেল স্টুডিওতে রয়েছেন কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা এবং চ্যানেলের অনুষ্ঠান সঞ্চালিকা। সঞ্চালিকা ঘোষণা করলেন "এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। সমগ্র রাজ্যের ১২ ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীর জন্য। আশাকরি তোমরা সকলে উপস্থিত আছো।"

সূচনা হল টেলিভিশনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের।

পড়ুয়ারা আগে থেকেই খাতা কলম নিয়ে টিভির পর্দার সামনে উপস্থিত ছিল। শুরু হল ইংরাজী পাঠ। দু-এক জন ছাত্র সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পেল। শিক্ষকরা যথাসাধ্য সরল করে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এইভাবে চললো এক ঘণ্টা। পরদিন জীব বিজ্ঞানের পালা।

দু মাস যাবৎ রোজ একঘণ্টার জন্য বোকা বাক্স পরিণত হয় ক্লাস রুমে। ইট কাঠ পাথর চক ব্ল্যাক বোর্ড বেঞ্চির বিকল্প ক্লাসরুম।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে টেলিভিশন ক্লাসরুমে পরিণত হয় প্রথম ১৯৭৫ সালে। ISRO এবং NASAর যৌথ প্রয়াসে এক বছর ব্যাপী একটি পরীক্ষা চলে, তার নাম SITE। ভারতের ছয়টি পিছিয়ে পড়া রাজ্যের ২৪০০টি গ্রামে শিক্ষামূলক কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রসারিত হয়। গ্রামে গ্রামে লাগানো হয় chicken mesh antenna। ২৪০০টি গ্রামে ২৪০০টি টিভি বসানো হয়। গ্রামের ছেলে বুড়ো ভীড় করে ক্লাব ঘরের সাদা কালো টিভির সামনে। তবে এই পরীক্ষামূলক কার্যক্রম এক বছরের বেশী টেকেনি। নতুনত্ব হয়ে যাবার পর গ্রামের লোকজন আর ক্লাব ঘরের ভীড় করতো না। যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে সারানোর লোক আসতো না।

এর পর ১৯৮২ সালে যখন ASIAD উপলক্ষে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রফেসর যশপাল UGCর কর্ণধার। উনি দেখলেন এই সুবর্ণ সুযোগ। দেশব্যাপী ইন্দ্রজালের সুযোগ নিয়ে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে উচ্চমানের উচ্চশিক্ষার বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে। শুরু হল Countrywide Classroom, অর্থাৎ কিনা দেশ জোড়া ক্লাসরুম। দূরদর্শন দ্বারা সম্প্রচারিত। দুঃখের বিষয়, নব্বই এর দশকের বাণিজ্যিকরণের জোয়ারে Countrywide Classroom দূরদর্শন থেকে অপসারিত হয়। এবং এপ্রিল ২০২০ তে করোনার কল্যাণে পুনরায় আবির্ভূত হয় টিভির পর্দায়। তবে এবার আর দূরদর্শন নয়। বেসরকারী টিভি চ্যানেলের পর্দায়।

কেমন হয় বোকা বাক্সের ক্লাস?

ঝা চকচকে টিভি স্টুডিও তে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। শুধু তো কথা নয়, সঙ্গে থাকে ছবি, ম্যাপ, সাদা বোর্ডে আঁকা ফরধমধধস। সবচেয়ে বড় কথা, রাজ্যের সব ছাত্র ছাত্রী সুযোগ পায় নামী, অভিজ্ঞ শিক্ষক দের কাছ থেকে পাঠ নেবার।

> দু মাস যাবৎ রোজ একঘণ্টার জন্য বোকা বাক্স পরিণত হয় ক্লাস রুমে। ইট কাঠ পাথর চক ব্ল্যাক বোর্ড বেঞ্চির বিকল্প ক্লাসরুম।

এক ঘণ্টার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ সকালের আরো এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করলো ছোটদের পাঠের জন্য। হৈ হৈ করে চললো ক্লাস। যদি কোন পড়ুয়া টিভির সামনে উপস্থিত থাকতে না পারে, সে পরে শিক্ষা পরিষদের e-portal এ অনুষ্ঠানটি দেখে নিতে পারে।

সবই ভাল কথা। কিন্তু ...

কিন্তু একটাই। এই ব্যবস্থা দীর্ঘ মেয়াদী হবে তো? জরুরী অবস্থার সাময়িক বন্দোবস্তে সীমাবদ্ধ না থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে কি? অসম্ভবকে সম্ভব করতে হলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে ক্লাস যখন টিভি তে হচ্ছে তখন টেলিভিশনের কিছু ধর্ম মেনে চলতে হবে।

টেলিভিশন anchor নির্ভর মাধ্যম। Anchor এর সঙ্গে দর্শকের একটি আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। Anchor যত জনপ্রিয় হয়, অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা সেই হারে বৃদ্ধি পায়। TRP বাড়ে।

এক্ষেত্র আমরা দেখছি anchor এর ভূমিকা শুধু সময় সীমার মধ্যে অনুষ্ঠান সঞ্চালন করা এবং দর্শকদের প্রশ্ন এগিয়ে দেওয়া – এই টুকুতেই সীমিত। অনুষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার করার ব্যাপারে সঞ্চালক আরো অনেক সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। আর কিছু না হোক, প্রতিটি উত্তরের পরে একবার ঝালিয়ে নেওয়া বা summing up, দর্শকদের উদ্দেশ্যে দু একটা হালকা মেজাজের কথা ছুঁড়ে দেওয়া – এই আরকি।

স্টুডিওতে অতিথি শিক্ষকদেরও কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ body language বা অঙ্গভঙ্গী, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাদের আর একটু মনোযোগী হতে হবে। ক্যামেরার চোখে চোখ রেখে কথা বলা, কথার মধ্যে একটু আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলা – যেন পড়ুয়াটি পাশেই বসে আছে – এইসব একটু অভ্যাস করলেই আয়ত্তে আসে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্নের উত্তর একটু ছোট করে এবং সহজ ভাষায় দেবার অভ্যাস করতে হবে। টেলিভিশনকে আমরা low brow মাধ্যম বলি। সুতরাং high brow বস্তুকেও low brow বা সহজ গ্রাহ্যভাবে উপস্থাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সারা রাজ্য জুড়ে ছাত্ররা বসে শুনছে। তাদের সকলের পাঠ গ্রহণের ক্ষমতা সমান নয়। কিন্তু শিক্ষককে সবার মনোযোগ কাড়তে হবে।

বিশাল শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁদের এই গুণগুলি স্বভাবসিদ্ধ। তাদেরকে খুঁজে নিতে হবে। এও এক ধরনের talent hunt।

তৃতীয়তঃ টেলিভিশন একটি দৃশ্য শ্রাব্য মাধ্যম। সুতরাং উপস্থাপনার মধ্যে দৃশ্যের অনুপাত বাড়াতেই হবে। এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে অন্যভাবে বিষয়বস্তুকে দৃশ্যমান করতে হবে। সে বিষয়বস্তু বিজ্ঞান হোক বা ইতিহাস। সরকারী শিক্ষা ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে শিক্ষকরা ক্লাসে visual aids ব্যবহার করবেন। বহু বিদ্যালয়ে এই নিয়ম পালিত হয় না। কিন্তু টিভির ক্লাস রুমে এই নিয়ম লঙ্ঘন করার খুব একটা যুক্তি আছে কি? ব্যাপারটি কঠিনও নয়, খরচ সাপেক্ষও নয়। প্রয়োজন শুধু পূর্ব পরিকল্পনা ও সৃজনশীল চিন্তা।

লক্ষ লক্ষ দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে এটুকু কষ্ট শিক্ষক সম্প্রদায় করতেই পারেন। মিডিয়া এবং শিক্ষা জগতের মেল বন্ধনের এই সুবর্ণ সুযোগকে কখনোই হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না।

মনে রাখতে হবে এর আগে দু দু বার টিভির পর্দাকে ক্লাসরুমে পরিণত করার প্রয়াস পরিপূর্ণ সাফল্য পায় নি। এবার কিন্তু টিভিতে ক্লাসরুম নব্য সাধারণ ব্যবস্থার এক আনন্দময় অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, ইঁট কাঠ পাথরের ক্লাস রুমের প্রতিযোগী হয়ে নয়, সহযোগীর ভূমিকায়। •

লেখিকা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিখন শিক্ষণ ও জনবিজ্ঞান প্রচারক।
ইমেল: subha.dasmollick@gmail.com

কোরোনাভাইরাসঃ মানব ও প্রাণীস্বাস্থ্য – একই পুস্তকের দুটি অধ্যায়

শ্রীমতী ঘোষ

কোরোনাভাইরাসের সংক্রমণের বিপদ হয়তো আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সামলে উঠতে পারবো, কিন্তু সেই সঙ্গেই অমীমাংসিত থেকে যাবে মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যেকার রোগ সংক্রমণের বিষয়টি।

তাই ভবিষ্যতে এই ধরণের ভয়াবহ রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা মাথায় রেখেই বিজ্ঞানীরা মানুষ ও প্রাণীদের মেলামেশা ও একে অপরকে সংক্রমিত করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

১৯৬০ সাল থেকেই কোরোনাভাইরাসের অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীরা অবগত আছেন। এখনো পর্যন্ত আমরা সাতটি কোরোনাভাইরাসের খবর জানি যারা মানবদেহকে সংক্রমিত করতে পারে। প্রত্যেকটি ভাইরাস একটা নতুন জীবাণু। এমনকি সার্স ভাইরাস ও সার্স-কোভ-২ ভাইরাসটির জিনগত ৭০% মিল থাকলেও নতুন ভাইরাসটির সংক্রমণের ক্ষমতা অনেক বেশি, তবে তুলনামূলকভাবে এতে মৃত্যুর হার কম। এই সব কারণে গবেষকদের নিত্য নতুন উপায়ে এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচবার উপায় খুঁজতে হচ্ছে।

কোরোনাভাইরাসের জিনের ৯৬% মিল আছে অশক্ষুরাকৃতি বাদুড়ের থেকে প্রাপ্ত ভাইরাসের সাথে, তাই এই সংক্রমণের সাথে বাদুড়ের সম্পর্ক যেমন উড়িয়ে দেওয়া যায় না তেমনি বাদুড় থেকে মানুষের সংক্রমণের মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্যাঙ্গোলিনের ভূমিকাও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্যাঙ্গোলিনের ও কোরোনাভাইরাসের থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনের মধ্যে ৯৯% মিল আছে বলে দাবি করছেন। যদিও মধ্যবর্তী অন্য কোনো প্রাণীর উপস্থিতির সম্ভাবনাও বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে।

রেবিস ভাইরাস একটি নিউরোট্রপিক ভাইরাস যেটি সংক্রমিত প্রাণীর কামড়ানোর জায়গা থেকে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছে যায়।

আবার বাসিল্যাস এন্থ্রাসিস জীবাণুর ভারী অদ্ভুত একটি অভিযোজন পদ্ধতি। এই জীবাণুটি এনথ্রাক্স রোগের সংক্রমণ ঘটায় মূলতঃ গবাদি পশুর শরীরে। মানব দেহে এই রোগ সংক্রমিত হলেও তা থেকে মৃত্যু হয় না।

কিছু ভাইরাস সংক্রমণের জন্য একটি বাহকের প্রয়োজন হয়। এর একটি উদাহরণ হিসাবে কায়াসানুর ফরেস্ট ডিজিজের (কে এফ ডি) নাম করা যেতে পারে যেখানে একটি পরজীবী টিক একটি বাহকের কাজ করে। এই সংক্রমিত টিকের কামড়ে বাঁদর বা অন্য ছোট বন্য প্রাণী সংক্রমিত হয় এবং মানুষের মধ্যেও এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পরে সংক্রমিত টিকের কামড়ে বা অসুস্থ বাঁদরের সংস্পর্শে এলে। কিন্তু এই ভাইরাসের মানব দেহ থেকে মানব দেহে সংক্রমণের খবর এখনো অজানা।

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বনাঞ্চল কেটে ফেলা এবং বন্যপ্রাণীদের বসতিতে হানা দেওয়ার ফলে এই সব সংক্রমণের হার অনেক বেড়ে গিয়েছে।

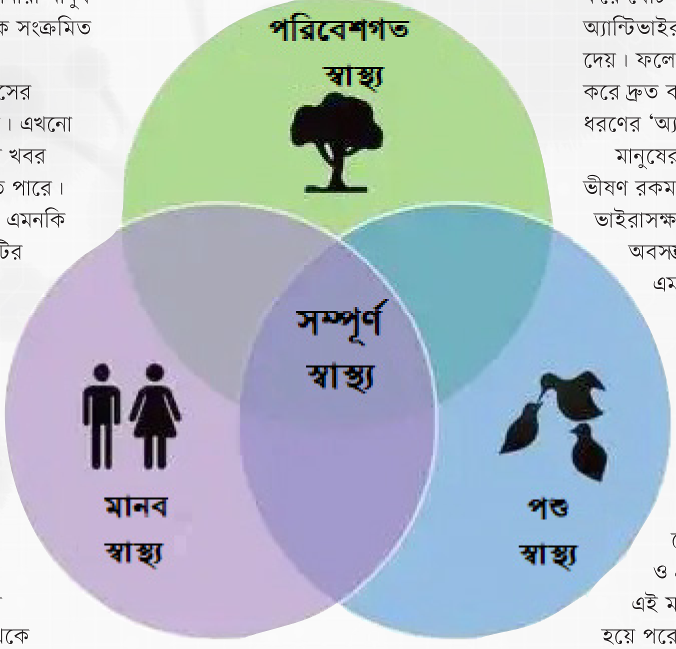

অনেক ক্ষতিকারক জীবাণু ক্রমাগত মিউটেশন বা 'প্রতিরোধক জিন' অর্জন করার ফলে জীবাণুনাশক ড্রাগস এ অনেক বেশি প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

এই সব সংক্রমণের ক্ষেত্রে মানুষকে বলা হয় 'ডেড এন্ড হোস্ট'। ভাইরাস মানব দেহ থেকে প্রাণীদের সংক্রমিত করার কোনো পরীক্ষিত তথ্য নেই। কে এফ ডি এবং অন্যান্য কিছু ভাইরাসের ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতঃ জীবাণুরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যখন তারা সংক্রমণের বা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু উল্লেখযোগ্য জ্যুনাটিক ভাইরাসের উদাহরণ হিসাবে সার্স ভাইরাস, মার্স ভাইরাস, ইবোলা ভাইরা, নীপা ভাইরাস এবং অবশ্যই নতুন কোরোনাভাইরাসের নাম করা যেতে পারে।

এই ভাইরাসের বেশির ভাগই বাদুড় থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয় এবং তার জন্য বাদুড়ের অ্যান্টিভাইরাল প্রতিক্রিয়াকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতেই পারে। এই উড়ন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মজবুত ইমিউন রেসপন্স থাকলেও তাদের প্রদাহজনিত প্রক্রিয়া ততটা মজবুত না হওয়ায় এরা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না।

পক্ষান্তরে বাদুড়ের শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে দেহকোষ 'ইন্টারফেরন আলফা' নিঃসৃত করে যেটি বাদুড়ের দেহের অপর কোষগুলিকে অ্যান্টিভাইরাল অবস্থাতে চলে যাবার সংকেত দেয়। ফলে ভাইরাসটি আশ্রয়দাতাকে বিব্রত না করে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। মানব দেহে এই ধরণের 'অ্যান্টিভাইরাল পদ্ধতি' নেই।

মানুষের দ্বারা বাস্তুচ্যুত হলে বা পরিবেশের ভীষণ রকম পরিবর্তনে এই বাদুড়ের লালায় ভাইরাসক্ষরণ অতিরিক্ত বেড়ে যায় যা অবসম্ভাবীরূপে অনেক সংখ্যক জীবজন্তু এমনকি মানুষকেও সংক্রমিত করে।

শুধু এই নয়, অনেক ক্ষতিকারক জীবাণু ক্রমাগত মিউটেশন বা 'প্রতিরোধক জিন' অর্জন করার ফলে জীবাণুনাশক ড্রাগস এ অনেক বেশি প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সম্পূর্ণ না হলেও ওষুধের কর্মক্ষমতা কমছে। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই একই শ্রেণীভুক্ত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস মানুষ ও প্রাণীদের প্রয়োগ করা হয়, তাই উভয়ই এই মাইক্রোবিয়ালস প্রতিরোধের অংশীদার হয়ে পরে।

কাঁচা ও দূষিত মাংস খবর অভ্যাস এবং পোল্ট্রি ও শূকর জাতীয় নানা পশুখাদ্যের প্রক্রিয়াকরণের বহুল ব্যবহার এই জীবাণুনাশক ড্রাগস-এর সমস্যাকে আরো অনেক বেশি জটিল করে তুলছে।

বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পের ক্রমবিকাশ ও আধুনিক জীবনযাত্রার ফলে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্রের ক্ষতির সাথে সাথে ক্ষতিকারক জ্যুনাটিক সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ছে।

যেহেতু প্রায় ৭৫% সংক্রমণই জ্যুনাটিক, তাই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিবিদ্যা বিশারদদের 'ওয়ান হেলথ' (সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য) কনসেপ্ট এ কাজ করা একান্ত প্রয়োজন।

এটি একটি ট্রান্সডিসিপ্লিনারি পদক্ষেপ, যা এককথায় পরিবেশ ও সমগ্র প্রাণিজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার খবর রাখে।

তাই এককথায় বলতে গেলে মানুষ ও প্রাণিজগতের অন্যান্য স্বাস্থ্যঘটিত সমস্যাকে আলাদা করে না দেখে একসাথে সমাধান করার কথা ভাবা প্রয়োজন। •

লেখিকা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ ও জনবিজ্ঞান প্রচারক;
ইমেল: sreemati.ghosh303@gmail.com

কোরোনাভাইরাস নিয়ে আর্থিক দুশ্চিন্তা

রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী

মানুষ্য সভ্যতা যত এগিয়েছে, সম্পদের আহরণে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ ছুটেছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। যখন সহজে কোনো জিনিস পাওয়া যায় নি, গায়ের জোরে দখল নিতে, ছুটেছে সেনাও। আর এই মানুষের আনাগোনাতেই এক দেশের রোগ ছড়িয়েছে অন্যত্র, কখনো তা মহামারী রূপে। মানুষের ইতিহাস তাই বাণিজ্যের ইতিহাস, সঙ্গে যুদ্ধের আর মহামারীরও। বিভিন্ন প্রকাশিত গবেষণা থেকে উইকিপেডিয়া ২৪৪টি মহামারীর তালিকা প্রস্তুত করেছে, সেখান থেকে গত কয়েক শতাব্দীতে এক লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এমন কয়েকটি মহামারীর উল্লেখ রাখলাম।

কোভিড-১৯ এখনো পর্যন্ত চার লক্ষ মানুষের জীবন নিয়েছে, আরো কত মানুষের জীবন যাবে তা বলা না গেলেও, কোরোনাভাইরাস এখনো পর্যন্ত অন্য পাঁচটা মহামারী আর অতিবিপর্যয় থেকে বেশ কিছু বিশেষত্ব বজায় রেখেছে।

সেগুলো একটু তুলে ধরা যাক: (ক) পৃথিবীতে এর আগে কোনো বিপর্যয়ে সারা বিশ্ব জড়ায় নি, এই মুহূর্তে ২৪৪ টি দেশে কোরোনা ছড়িয়ে আছে। (খ) সারা বিশ্ব জুড়ে লকডাউন এর আগে কেউ দেখে নি (প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, ইংল্যান্ডে কার্নিভালের সময় অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে পুলিশ লকডাউন শব্দটি ব্যবস্থার করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তখন থেকেই ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটির আগমন, আজ সে সার্বজনীন)। (গ) কোরোনাভাইরাসের ক্ষয়ক্ষতি অধিকাংশই লকডাউন সংক্রান্ত আর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অহেতুক ব্যয়ের বোঝা নিয়েই। অবশ্য রোগযন্ত্রণা, প্রিয়জনকে হারানো, আতঙ্কে ছোটাছুটি, মানসিক দুশ্চিন্তা এসব তো রয়েছেই। (ঘ) এতকাল সব মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদিতে দেশের উৎপাদন সক্ষম বয়সের মানুষের বিপদ ঘটেছে (অবশ্য কয়েক দশক আগেও বয়স্করা ছিল হাতে গোনা, আজ তারা সংখ্যায় ও জনসংখ্যার অনুপাতে বেশ ভারী)। কোভিড-১৯ আক্রমণ করছে বিশেষকরে বিশ্বের প্রবীণ নাগরিকদের। সাধারণ অর্থনীতির বিচারে বয়স্করা পরজীবী, রাষ্ট্রের বা পরিবারের আয়েই তাদের প্রতিপালন, সম্পদ আহরণে এদের ভূমিকা সীমিত। মানুষের দীর্ঘ জীবন সভ্যতার আশীর্বাদ বলেই স্বীকৃত, কোরোনা আক্রমণ করলো সেখানেই। (ঙ) কোরোনায় দেশের সম্পত্তি, মেশিনপত্র বা সংক্ষেপে বলতে গেলে পুঁজির কোনো ক্ষতি করে নি। (চ) বিপদ থেকে মানুষ শিক্ষা নেয়, কোরোনার পর গৃহস্থের অযথা খরচ কমবে, এটা আশা করা যেতেই পারে। দেশের সঞ্চয়ের সিংহভাগ আসে গৃহস্থের আয়ের উদ্বৃত্ত থেকে। উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোদমে চালু হলে সংশয় বাড়ার কথা। আর সঞ্চয় বিনিয়োগই আর্থিক অগ্রগতির হার বাড়ায়।

অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের পরেই উত্থান আসে। তবে কবে এই বিপর্যয় মিটবে বলা কঠিন। এর আগে লক্ষাধিক মৃত্যু হাওয়া কোনো মহামারী সহজেই মেটে নি। বছর গড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কোভিড-১৯ পুরোপুরি নিস্তব্ধ হতে কয়েক বছর সময় নেবে। এর মধ্যে বিরাট সংখ্যক মানুষ চাকুরী বা জীবিকা হারিয়ে রাষ্ট্রের দরবারে। ধনী দেশে এই সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সহায়তা বাধ্যতামূলক। তবে দীর্ঘ মেয়াদে সহায়তা দেবার ব্যবস্থা বা সমর্থ কোনো রাষ্ট্রেরই নেই। মার্কিন সরকারের শ্রম দপ্তরের সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী প্রায় তিন কোটি মানুষ কৃষির বাইরে চাকুরী হারিয়েছেন, অধিকাংশ হোটেল ও বিনোদন ক্ষেত্রে। কেবল মার্চ মাসে ২৮ হাজার চাকুরী গেছে সরকারি ক্ষেত্রেই। গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহামন্দায় দশ শতাংশ মানুষের কাজ হারিয়েছিল, এটা এখন প্রায় কুড়ি শতাংশ। তবে আমেরিকায় চাকুরী গেলে বেকারভাতা পাওয়া যায়, মোটামুটিভাবে সাড়ে-ছয় সপ্তাহের। বিভিন্ন প্রদেশে ভাতা বিভিন্ন হলেও কোরোনা মহামারীর আগে গড়ে ভাতা ছিল ৩৭৮ ডলার, ২৭শে মার্চ ২০২০ ট্রাম্প সরকার কেয়ার্স আইন মোতাবেক ওটাকে আরো ৬০০ ডলার বাড়িয়েছে, জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। কানাডায় সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এপ্রিলে বেকার ছিল ১৩ শতাংশ, ৭২ লক্ষ মানুষ বেকার ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

ইংলন্ডে চাকুরী হারালে বা আয় কোনো কারণে কমে গেলে সার্বজনীন ভাতা (ইউনিভার্সাল ক্রেডিট) পাওয়া যায়, লকডাউন শুরুর পর থেকে কুড়ি লক্ষ মানুষ এই ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। ফ্রান্সে লকডাউন শুরুর পর প্রায় এক লক্ষ মানুষ সরকারের কাছে সোমেজ পার্শিয়াল বা আংশিক সময়ের কাজের আবেদন করেছেন। জার্মানিতেও কোরোনা লকডাউন শুরু থেকে প্রায় এক কোটি মানুষ কুরজাবাইট বা আংশিক সময়ের সরকারি কাজের আবেদন করেছেন। মস্কো নিউজ (মে ২০, ২০২০)-এর খবর অনুযায়ী রাশিয়ার বেকারির হার এখন ত্রিশ শতাংশ, ১৭ লক্ষ মানুষ কর্মহীন। এখন সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। ভারতে বেসরকারি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, CMIE জানাচ্ছে বেকারির হার, যেটা ফেব্রুয়ারী ২০২০ তে ৭.৭৬ শতাংশ ছিল তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩.৪৮ শতাংশে। ভারতের শ্রম দফতরের ব্যুরো অফ লেবার এর হিসাব অনুযায়ী দেশে ২০১৫ সালে শ্রমের যোগান দেয় ৪৭ কোটি মানুষ। প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষ করে শ্রমের যোগান বাড়লে এখন দেশে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষ কাজ করছে বা কাজ খুঁজছে। CMIE-এর হিসাব সঠিক হলে কোরোনার ফলে দেশে এখন দশ কোটি বেকার। দেশে কোনো সুনির্দিষ্ট বেকার ভাতার প্রকল্প নেই, চাকুরী হারানো মানুষের দুর্দশা সহজেই অনুমেয়।

জীবিকার সন্ধানে ভারতের বহু মানুষ এখন দেশের মধ্যেও প্রবাসী। ২০১১ সালের জনগণনার মাইগ্রেসন সংক্রান্ত তথ্য গত বছর প্রকাশিত, দেখা যাচ্ছে প্রায় সাড়ে নয় কোটি মানুষ পরিবার সমেত জন্মস্থানের বাইরে স্থানান্তরিত। এক থেকে নয় বছর অবধি এরা ঘরের বাইরে। পশ্চিমবঙ্গে এইরকম মানুষের সংখ্যা ৬৫ লক্ষ। ঘরের বাইরে অস্থায়ী আস্তানায় গাদাগাদি করে কোনোভাবে রাত কাটিয়েছেন এই সব মানুষজন। লকডাউনে ২৪ ঘন্টা ঘরে থাকার সুবিধা নেই। ছটফট করছেন ঘরে ফিরতে, পরিজনদের সাথে মিলতে, প্রত্যাশা গ্রামের কৃষিই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। যে যেভাবে পেড়েছেন ঘরে ফিরেছেন, অধিকাংশই ট্রেনে। দূরত্ববিধি মেনে যে সব কিছু হয়েছে তা নয়, সংক্রমণ ছড়িয়ে যাবার সম্ভবনা ব্যাপক। দেশে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা দশহাজার ছাড়িয়েছে,

ঘটনা	সূচনা	শেষ	মৃত্যু (লক্ষ)
ব্ল্যাক ডেথ (কালো মৃত্যু)	১৩৩১	১৩৫৩	৭৫
ইতালীয় প্লেগ	১৬২৩	১৬৩২	২.৮
সিভিল এর মহামড়ক	১৬৪৭	১৬৫২	২০
লন্ডনের গ্রেট প্লেগ	১৬৬৫	১৬৬৬	১
মার্সেইয়ের মহামড়ক	১৭২০	১৭২২	১
প্রথম কলেরা মহামারী	১৮১৬	১৮২৬	১
দ্বিতীয় কলেরা মহামারী	১৮২৯	১৮৫১	১
রাশিয়া কলেরা মহামারী	১৮৫২	১৮৬০	১০
গ্লোবাল ফ্লু মহামারী	১৮৮৯	১৮৯০	১০
ষষ্ঠ কলেরা মহামারী	১৮৯৯	১৯২৩	১
এনসেফ্যালাইটিস লেথার্গিকা মহামারী	১৯১৫	১৯২৬	১৫
স্পেনীয় ফ্লু	১৯১৮	১৯২০	১০০০
এশিয়ান ফ্লু	১৯৫৭	১৯৫৮	২০
হংকং ফ্লু	১৯৬৮	১৯৬৯	১০
এইচ১এন১ মহামারী	২০০৯	২০১০	২.০৩

উইকিপেডিয়া এবং সেখানে উদ্ধৃত তথ্য

গোষ্ঠী সংক্রমণে এত জনঘনত্বের দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বহু দূরেও যেতে পারে।

তবে এত বিপত্তির মধ্যেও কোথাও কোনো খাবার নিয়ে লুটতরাজের খবর নেই,এমনকি পশ্চিমবঙ্গে আমফানে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাবার পর জ্বালানির জন্য গাছপালা কেটে ঘরে নেবার সেরকম কিছু প্রবণতাও দেখা যায় নি। বোঝাই যাচ্ছে খাবার দাবারের সেভাবে কিছু অভাব আসে নি। বাজারে পাইকারি দরের ভিত্তিতে খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৭.২৪, মার্চে নেমেছে ৫.৪৯, এবং এপ্রিল ২০২০ তে কমে দাঁড়ায় ৩.৬০ তে। তাই বাজার থেকে জিনিস কিনতে সমস্যা হবার কথা নয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় গণবন্টন ব্যবস্থায় দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ৫ কেজি গম/চালের সঙ্গে ১ কেজি ডাল পাচ্ছেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, এটা আগামী তিন মাস বলবৎ থাকবে। এটা রেশন ব্যবস্থার অতিরিক্ত। প্রধানমন্ত্রী কিষান প্রকল্পে প্রায় নয় কোটি কৃষক বছরে ৬ হাজার টাকা পাচ্ছেন। এমেনরেগা (একশো দিনের কাজ) প্রকল্পের পাঁচ কোটি মানুষের মজুরি ১৮২ থেকে বাড়িয়ে ২০২ টাকা করা হয়েছে। দেশের তিন কোটি বয়স্ক, বিধবা আর প্রতিবন্ধীদের আগামী তিন মাসের জন্য একহাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। ২০ কোটি জন ধন একাউন্ট থাকা মহিলাকে তিন মাসের জন্য মাসে ৫০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। আগামী তিন মাস উজ্জ্বলা প্রকল্পের দারিদ্রসীমার নিচে থাকা ৮ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবার বিনামূল্যে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার রিফিল করতে পারবেন। গত বছরের ১৯শে জুন পর্যন্ত উজ্জ্বলা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গেই ৮০ লক্ষ ৬৬ হাজার গ্যাস সংযোগ করা হয়েছে। দেখতে অপ্রতুল লাগলেও জনতা জনার্দন এতেই খুশি। অন্যদিকে, দেশে খাদ্যশস্য যথেষ্ট মজুত আছে। এই মরসুমে রেকর্ড ২৯ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন হবার কথা। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বছরে ৫ থেকে ৬ কোটি টন খাদ্যশস্য লাগে, সরকারি গোদামে এই মুহূর্তে ১০ কোটি টন খাদ্যশস্য মজুত আছে।

পরিশেষে এইটুকু বলা যায়, কোরোনার কোপ যতই পড়ুক না কেন আমরা খুব একটা বিপদে নেই। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের গত এপ্রিল ২০২০ র বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়েছে ২০২০ সালে যখন বিশ্ব অর্থনীতির অগ্রগতির হার থাকবে মাইনাস তিন, সব উন্নত দেশ মাইনাস ৬.১, এমন কি চীনে ১.২, আমাদের দেশে সেটা ১.৯ থাকার কথা। কোরোনা ভাইরাসের সূত্রপাত জনিত কারণে অথবা এই রোগ সংক্রান্ত সঠিক খবর বিশ্বের কাছে পৌঁছে না দেবার কারণে, চীন আজ সন্দেহের তালিকায়। আজ ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে অনেক দেশ চীনের মুখাপেক্ষী। এতকাল খোঁজে নি, কোরোনা আজ তাদের পাঠাচ্ছে বিকল্পের সন্ধানে। ভারতে আত্মনির্ভরতা শুরু হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান মেধার অভাব নেই। সঠিক নেতৃত্ব ও পরিকাঠামোয় আমাদের 'পেটেন্ট বিপ্লব' শুরু হলে আমরা অচিরেই চীনের কিছুটা বিকল্প হতে পারি। তবে হ্যাঁ, দূরত্ববিধি এখন আমাদের জীবনের অঙ্গ, সেটা মেনেই ধীরে ধীরে ব্যস্ত জীবনে ফিরে আসাটাই আমাদের কাজ। •

লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফি এবং অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। ইমেল: rgdc2000@gmail.com

মহাকাশযাত্রা ও কোয়ারান্টাইন

মানস প্রতিম দাস

ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন নিরাপদ রাখার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হয়। তবু কি সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা গিয়েছে সেই ভাসমান মহাকাশযানকে? ২০১৯ সালের এপ্রিলের গোড়ায় জানা গেল যে ব্যাক্টিরিয়ার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে সেখানে। শতকরা ভাগও দেওয়া হল মাইক্রোবায়োম জার্নালে। খুঁজে পাওয়া ব্যাক্টিরিয়ার ছাব্বিশ শতাংশ হল স্ট্যাফাইলোকক্কাস, তেইশ শতাংশ প্যান্টদিয়া এবং এগারো শতাংশ ব্যাসিলাস গণের। প্রাণীজগতের সদস্যদের বৈজ্ঞানিক নামকরণে বড় থেকে ছোট নানা বিভাগ করা হয়, মই বেয়ে নামতে থাকলে পাওয়া যায় 'গণ', তার নীচে শেষ ধাপে আছে 'প্রজাতি'।

এই যেমন স্ট্যাফাইলোকক্কাস গণের মধ্যে রয়েছে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস প্রজাতি, মানুষের নাকের মধ্যে বা চামড়ায় যাদের পাওয়া যায়। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে তার উপস্থিতির শতকরা ভাগ এগারো। হঠাৎ করে ধরা দেয় নি এই জীবাণুর দল! চোদ্দ মাসের ব্যবধানে, তিন বার যাতায়াতের সময় মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করে আনা হয় নমুনা। মহাকাশ কেন্দ্রের মোট আটটা জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে ডাইনিং টেবিল, টয়লেট, যে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা হয় সেই ভিউয়িং উইন্ডো, শারীরিক কসরতের জায়গা ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন স্পেস স্টেশনে ব্যাক্টিরিয়াদের এমন উপস্থিতি কি অস্বাভাবিক? সেগুলো কি মহাকাশচারীদের অসুস্থ করে তুলতে পারে? গবেষকরা জানিয়েছেন যে প্রায় অভিকর্ষ-শূন্য, মাইক্রোগ্র্যাভিটির অমন একটা জায়গায় ব্যাক্টিরিয়াদের রোগ ঘটানোর ক্ষমতা থাকে কিনা তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে বলার সময় আসে নি। তবে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা অনেক সোজাসাপ্টা। অফিস, হাসপাতাল, জিমন্যাসিয়াম ইত্যাদি জায়গায় হামেশাই পাওয়া যায় ব্যাক্টিরিয়াদের এমন উপস্থিতি। ফলে মহাকাশ কেন্দ্রে এই সব ব্যাক্টিরিয়াদের খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক নয় মোটেই।

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা সুদূর মহাকাশ বা ডীপ স্পেসে থাকা যানের নিরাপত্তার যে মানদণ্ড তৈরি করেছে তা পূরণ করতে এই জীবাণুদের ভূমিকা বোঝা দরকার। শুধু কি মানুষের শরীরেই প্রভাব ফেলতে পারে এগুলো নাকি মহাকাশযানের কাঠামোরও ক্ষতি করতে পারে? ২০২০ সালের শুরুতে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির এক গবেষণায় জানা যায় যে মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে জীবাণুদের শক্তি তেমন কমে না। বরং কিছু ছত্রাক তো ধাতব তলের উপরে বংশবিস্তার করে মাহাকাশযানের কাঠামোর ক্ষতি করে।

মহাকাশযাত্রার শুরুর দিকে নভোশ্চরদের অসুস্থ হবার ঘটনা ঘটেছিলো। ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশিতে ভুগতে থাকেন অ্যাপেলো ৭ মহাকাশযানের যাত্রীরা। শেষ হয়ে যায় ওষুধ এবং এমনকি টিসু পেপার। এমন ঘটনা বিরল হলেও নভোশ্চরদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে মহাকাশযান ওড়ার আগে কোয়ারান্টিন প্রথা চালু করা হলো। দু-সপ্তাহের কোয়ারান্টিনে থাকতে হয় স্পেস স্টেশনের যাত্রীদের।

সব মহাকাশ সংস্থা এই নিয়ম মেনে চলে। এই প্রথার আরেকটা লক্ষ্য মহাকাশে যাতে পৃথিবীর জীবাণু পৌঁছে না যায় তা দেখা। এই সময় নিয়মিত পরীক্ষা হয় মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্যের। সম্ভাব্য সব রকম জীবাণু পরীক্ষা হয় এই সময়। তবে বার্ড-ফ্লু, ইবোলা বা নোভেল কোরোনাভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক অনেক বেশি। যেমন আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন জানাচ্ছে যে কোরোনাভাইরাস গোষ্ঠীর মাত্র সাতটি ভাইরাস মানুষের শরীরে রোগ ঘটাতে পারে। একই সঙ্গে বিশ্বের তাবৎ স্বাস্থ্য সংস্থা এই ধরণের ভাইরাস র পরিবর্তনশীলতা নিয়ে সাবধান করে দিয়েছে।

পশুদের শরীর আক্রমণ করে যে সব কোরোনাভাইরাস সেগুলো কখনো-কখনো বিবর্তিত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে মহাকাশের অভিকর্ষহীনতায় এবং সেখানকার তাপমাত্রায় কোরোনাভাইরাসের কেমন পরিবর্তন হতে পারে? সেই বদল কি মানুষের পক্ষে আরো বড়ো বিভীষিকা ডেকে আনবে? এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর জানা নেই বলে মহাকাশচারীদের কোয়ারান্টিনে আরো বেশি সাবধানতা নিতে চাইছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো।

মানুষের মাধ্যমে যদি মহাকাশে জীবাণু পরিবহনের ভয় থাকে, তবে কি উল্টোটা হতে পারে না? অর্থৎ মহাকাশ থেকে আসতে পারে না জীবাণু? সেই ভয় থেকেই অ্যাপেলো ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪র যাত্রীদের মোবাইল কোয়ারান্টিন ফ্যাসিলিটিতে রাখা হয় পৃথিবীতে ফেরার পরে। এর মেয়াদ ছিল ২১ দিনের। এরপর নানা প্রমান থেকে ঘঅঝঅ মনে করলো যে চাঁদ আসলে প্রাণহীন। তাই অ্যাপেলো ১৪র পর থেকে চাঁদ ফেরত যাত্রীদের জন্য কোনো কোয়ারান্টিন রাখা হলো না। আজ কেমন হবে ব্যবস্থাটা? এই কিছুদিন আগে অবধি সপ্তাহখানেকের কোয়ারান্টিনে থেকেছেন স্পেস স্টেশন থেকে ফেরা যাত্রীরা। আবারও, এর প্রধান লক্ষ্য নভোশ্চরদের স্বাস্থ্যরক্ষা। মহাকাশ থেকে ফেরা যাত্রীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা নিষ্ক্রিয় থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার সুযোগ দিতেই এই আয়োজন। কোভিড পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়েছে। পৃথিবীতে ফেরা যাত্রীদের জন্য কোয়ারান্টিনের মেয়াদ কি তাহলে আরো বাড়বে? •

লেখক আকাশবাণীর বিজ্ঞান সম্প্রচারক। ইমেল: i2manas@gmail.com

মানবজাতির কলঙ্কের এক নতুন অধ্যায়

পার্থ প্রতিম মজুমদার

মানবজাতির ইতিহাস নিয়ে আমরা গর্বিত। গর্ব করার অনেক কারণ আছে। সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস কলঙ্কবিহীন নয়। এই কলঙ্কের ইতিহাসগুলো আমাদের মাঝে মাঝে স্মরণ করা উচিত। স্মরণ করলে আমরা তাদের পুনরাবৃত্তি এড়াতে সক্ষম হতে পারি।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে , জার্মানি-অধিকৃত ইউরোপ জুড়ে নাৎসি-জার্মান এবং তাদের সহযোগীরা ইউরোপের প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল। খ্রীস্টানরা ইহুদিদের ঘৃণা করেছিল শুধুমাত্র ইহুদিদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য নয়। ইহুদিদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিও এই ঘৃনাকে ত্বরান্বিত করেছিল। ঘৃণার প্রধান কারণগুলি প্রায়শই অস্পষ্ট থাকে। উনিশ শতকের ইহুদিরা কঠোর পরিশ্রম করে আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়। ধনী ইউরোপীয় শাসক শ্রেণী ইহুদিদের আর্থিক সাফল্যের কারণে হুমকি অনুভব করেছিলো এবং তারা দরিদ্র লোকেদের ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করেছিল। ইহুদিবিদ্বেষ বা কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ কলঙ্কের পরিচয়।

সাম্প্রতিককালে ১৯৮০ র দশকের গোড়া থেকে এইডস রোগীদের সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য একটি গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। খুব শীঘ্রই এইচআইভি সংক্রমিত লোকেদের প্রতি সাধারণ মানুষের এই আচরণ মানব জাতির এক কলঙ্ক রূপে পরিণত হয়েছিল। সুখের বিষয়, আমরা আমাদের কথা ও কর্মের মাধ্যমে এইচআইভি কলঙ্কের অবসান ঘটিয়েছি, তাদের প্রতি আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এবং সহযোগিতার নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে।

আজ সকালে খবরের কাগজের পাতা খুলতেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। এক নার্সকে তার নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য একদল পুলিশকে সাথে নিয়ে আসতে হয়েছিল। কারণ, তিনি কোরোনাভাইরাস সংক্রমিত এক ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদান করেছিলেন এবং তিনি স্ব-বিচ্ছিন্নতা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। পথে পাড়ার দাদারা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলো সে তার বাড়ি যেতে পারবে না; তাকে অন্য কোথাও নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।

কিছুদিন আগে আমার বন্ধুর মা কোরোনাভাইরাস রোগে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রাজ্য স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিবারের তিন সদস্যকে একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে তাদের পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয়। তাদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। তারা সবাই কোরোনাভাইরাস নেগেটিভ হয়েছিলেন। পরীক্ষা শেষে তাঁরা বাড়ি ফিরেছিলেন। তাঁদের প্রতিবেশীরা তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ না করার আদেশ দেয়। পরিবর্তে অন্য কোথাও অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে বলেছিলো। বাধ্যও করেছিল।

আরো মর্মান্তিক ঘটনা হচ্ছে যে, প্রতিবেশীরা আমার এক চেনা পরিবারকে তাঁদের এপার্টমেন্ট থেকে তাড়িয়ে দেয় কারণ সেই পরিবারের একজন সদস্যা কোরোনাভাইরাস টেস্টিং সেন্টারে কাজ করছিলেন।

আমাদের রোগ সৃষ্টির পাশাপাশি, এই কোরোনাভাইরাস আমাদের মধ্যে গভীর ভয়েরও সৃষ্টি করেছে। আক্রান্ত হবার ভয়। সংক্রমণ থেকে মৃত্যুর ভয়। ভয় কলঙ্কের জন্ম দেয়। কলঙ্ক বৈষম্যের জন্ম দেয়। আমাদের প্রত্যেককেই এই ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত "কলঙ্ক এবং বিশ্বস্বাস্থ্য" (Stigma and Global Health) শীর্ষক একটি সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম ২০০২ সালে। ২৩টি উন্নয়নশীল দেশ সহ ৩০ টি দেশের ২৫০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন এই সম্মেলনে। এইচআইভি/এইডস মানসিক স্বাস্থ্য, মৃগী, শারীরিক অসঙ্গতি, অ্যালকোহোল ও মাদকের অপব্যবহার, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, জেনেটিক্স, জাতি এবং লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। বক্তৃতার প্রস্তুতির জন্য আমি আরভিং গফম্যানের "স্টিগমা" নামক একটি বই পড়ছিলাম। এই বইটি মিস লোনলিহার্টসকে (নাথানিয়েল ওয়েস্টের লেখা একটি বই) লিখিত একটি চিঠির প্রতিলিপি দিয়ে শুরু হয়েছিল। "তুমি কি বিপদে আছো? তোমার কি পরামর্শ দরকার? মিস লোনলিহার্টসকে লেখো তিনি তোমাকে সহায়তা করবেন।" চিঠিটা লিখেছিলো ষোলো বছরের এক কিশোরী। সে চিঠিটা সাইন করেছিল "আপনার বিশস্ত ডেসপারেট (মরিয়া এক ব্যক্তি)"। চিঠির শেষ লাইনে সে মিস লোনলিহার্টসকে জিজ্ঞাসা করছে "আমার কি আত্মহত্যা করা উচিত?" কারণ সে লক্ষ্য করেছে যে প্রত্যেকে তাকে এড়িয়ে চলে। কেন? "আমি নাক ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছি।" মেয়েটির এই বিরল জেনেটিক ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করাটা দুর্ভাগ্য, তাঁর দোষ নয়। তবু তাকে এড়িয়ে চলছে বেশিরভাগ লোকই। তাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। কলঙ্ক জন্ম নিয়েছে ভয় থেকে। "আমার মুখের মাঝখানে একটা বড়ো গর্ত রয়েছে যা মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়, এমনকি নিজেকেও।"

এখন আবার কোভিড-১৯-এর ভয় কলঙ্কের জন্ম দিচ্ছে। এই কোরোনাভাইরাসটি অবশ্যই ভয়ঙ্কর। এ এক অদ্ভুত ও সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। কাজের ক্ষতি। জীবিকার ক্ষতি। জোর করে সামাজিক যোগাযোগ এড়ানো। জোর করে নিজেকে ঘরবন্দি করা।

আসলে যে করেই হোক, আমাদের সংক্রমণ এড়াতে হবে। তবে কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে কলঙ্কিত করা বা "বিপজ্জনক" হিসাবে স্টাম্পিং করা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। অনেকেই মনে করেন যে স্টাম্পিং করলেই সংক্রমণের বিস্তার রোধ করা যায়। প্রকৃত-পক্ষে, কলঙ্ক বা সামাজিক প্রান্তিকীকরণ এই রজার বিস্তারের ওপর বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক সংক্রমিত ব্যক্তি, যাদের কেবলমাত্র হালকা লক্ষণ রয়েছে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন নেই। হালকা লক্ষণ যুক্ত এই ব্যক্তিদের যদি তাদের নিজেদের বাড়িতে থাকতে না দেওয়া হয়, তবে তারা নিজেদের সংক্রমণের লক্ষণ সম্পর্কে কাউকে অবহিত নাও করতে পারে। অবহিত না করলে পৃথকীকরণ বা চিকিৎসার বিলম্ব হতে পারে। বিলম্বের ফলে সমাজে দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। সংক্রমণ রোধে ব্যবস্থা নেওয়া খুব জরুরি। আমরা সকলেই বিভিনড়ব পদক্ষেপ গুলি অনুসরণ করছি। তবে, সংক্রমিত ব্যক্তি আমাদেরই একজন। তার সাথে আমাদের মর্যাদাসূলভ ব্যবহারই করতে হবে। কোনো সংক্রমিত ব্যক্তিকে সামাজিক প্রান্তিকীকরণ করলে তার ফল ভালো হবার বদলে খারাপ হয়। সামাজিক সংহতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এই বিরূপ প্রভাবগুলি কোরোনাভাইরাসটি আমাদের মধ্যে থেকে চলে যাওয়ার দীর্ঘদিন পরেও অনুভূত হবে। এটা মোটেই কাম্য নয়।

কারখানা এবং কর্মক্ষেত্রগুলি শীঘ্রই কয়েক মাস লকডাউনের পরে আবার খোলা হবে। এটি অনিবার্য যে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে এমন কয়েকজন ব্যক্তি থাকবেন যারা কোরোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েও বেঁচে ফিরেছেন। সহকর্মীরা এই সব লোকেদের এড়িয়ে চলতে পারেন সেই সম্ভাবনা উড়িয়া দেওয়া যায় না। অবাক নেত্রে তাদের দিকে অনেক সহকর্মী তাকিয়ে থাকবেন। এড়িয়ে চলা বা অনেক চোখে তাকিয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। তবুও এসব ঘটতে বাধ্য, দুর্ভাগ্যক্রমে।

গ্রীকরা কলঙ্ক শব্দটির উদ্ভব করেছিল। অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ করার জন্য শরীরের ওপর ছাপ মারা হতো; সেগুলোকে 'স্টিগমা' বা 'কলঙ্ক' বলা হতো। ক্রীতদাস বা অপরাধীদের শরীরের ওপর গরম লোহা দিয়ে বা ছুরি দিয়ে কেটে এই ছাপগুলো দেওয়া হতো। আজকাল অবশ্য মর্যাদাহানি করার জন্য মানুষের বা মনুষ্যগোষ্ঠীর ওপর কলঙ্ক লেপে দেওয়া হয়। বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সক্রিয়ভাবে কলঙ্কিত করি না। ভয় পেয়ে আমরা এমন আচরণ করি যে অন্য লোকেরা কলঙ্কিত হয়। যেমন কোরোনাভাইরাসের ভয়ে আমরা এমন আচরণ করছি যে সংক্রমিত ব্যক্তিরা কলঙ্কিত হচ্ছে।

আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা দরকার যে কোরোনাভাইরাস কীভাবে ছড়িয়ে পরে। কীভাবে আমরা এর বিস্তার এড়াতে পারি। আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা দরকার যে কোরোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে খুব কম লোকেই আসলে মারা যায়। সংক্রমিত লোকেদের মধ্যে শতকরা মাত্র তিন জন মারা যায়। এদিক থেকে ভাবলে কোরোনাভাইরাসটি খুবই দয়ালু। প্রচুর মানুষের মধ্যে বাসা বাঁধে কিন্তু তাদের মেরে ফেলে না। তবু আমাদের আলোচনা করা উচিত যে কীভাবে সংক্রমিত হওয়া এড়াতে পারি। আর, যারা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে কিংবা যারা সংক্রমিত হয়েও সেরে উঠেছে তাদের কেন এড়িয়ে চলা উচিত নয়। তাদের সাথে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিনিষ্ঠ আচরণ করা উচিত। আমরা এসব বিষয় নিয়ে যত বেশি আলোচনা করবো ততই নিরাপদ হবে আমাদের সমাজ, ততই বৈষম্যহীন হবে, ততই কুসংস্কারমুক্ত হবে, এবং ততই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা দিয়ে চালিত হবে আমাদের সমাজ। •

লেখক ইন্ডিয়ান একাডেমি অব সাইন্সেস এর সভাপতি।
ইমেল: ppm1@nibmg.ac.in

মহামারী মডেল ও কোভিড-১৯

রিন্টু নাথ

গত ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণের ভয়াবহ প্রভাব বিশ্বব্যাপী প্রকট হয়ে উঠেছে যা বর্তমান যুগের সবথেকে বড় সঙ্কটময় অতিমারী রূপে প্রকাশিত। প্রাথমিকভাবে এই মহামারী ২০১৯ নভেল করোনাভাইরাস নামে পরিচিত হলেও ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন ট্যাক্সোনমি অফ ভাইরাসেস ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২০, এর নামকরণ করেছে সিভিয়ার একিউট রেস্পিরাটরি সিন্ড্রোম করোনাভাইরাস-২। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস বাহিত রোগটির নামকরণ করেছে কোভিড-১৯।

বর্তমানে এই রোগের কোন প্রতিষেধক নেই, এই মুহূর্তে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাও শুধুমাত্র নন-ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারভেনশন বা অ-চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পদ্ধতির ওপরই নির্ভরশীল। তাই মহামারী বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্যকর্মী ও নীতি নির্ধারকরা বিশ্বব্যাপী এমন কিছু কর্মপদ্ধতি খোঁজার চেষ্টায় আছেন যাতে এই অতিমারীর প্রভাব কম করা যায় মৃত্যুহার হ্রাস পায় ও বর্তমান জনসাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর কিছুটা চাপ কমে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার তীব্র নজরদারি চলছে এই সংক্রমনের বিস্তার, কতজন সংক্রামিত হচ্ছে, সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা, মৃত্যুর হার ও এই সংক্রমণ এর সাথে যুক্ত নানা বিষয়ের ওপর। সংক্রমণের সাথে যুক্ত বিষয় বলতে আমরা বুঝি ভৌগোলিক অবস্থান, জনঘনত্ব, কার্যকরী স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সংক্রমণ বিস্তারের অন্যান্য কারণগুলি। যদিও এসব তথ্যগুলো খবরের মুখ্য উপাদান হয়ে দেখা দিচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দরকার বিশাল তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও পরিবেশন।

ক্রমবর্ধমান এই মহামারী থেকে উঠে আসা এই বিপুল তথ্যভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে মহামারী বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা নানা গাণিতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহামারী মডেল উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ করে এর ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে পূর্বাভাস অনুমান করতে পারেন। তাঁরা পুরনো এবং সাম্প্রতিক, উভয়প্রকার তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি উভয়ক্ষেত্রেই এই মহামারীর কী প্রভাব পড়তে পারে তার ওপর কিছু মডেল তৈরি করেন। এই মডেলগুলি নীতিনির্ধারকদের সাহায্য করে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির সুযোগ ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জেনে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। এই প্রবন্ধে আমরা মহামারী মডেলের উদ্ভাবন ও তার কার্যকারিতা এবং মহামারী নিয়ন্ত্রনে এই মডেলগুলি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

মহামারী মডেলের ইতিহাস

সার্স-কোভ-২ বিস্তারের আগেও বহুবার বিশ্বব্যাপী নানা মহামারী দেখা দিয়েছে। যেমন গুটিবসন্ত, পোলিও, কলেরা, জলবসন্ত, জাইকা, ইবোলা, সার্স, ইত্যাদি। এদের কিছু সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা গেছে, কিছু মহামারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া গেছে মহামারী মডেলের ভিত্তিতে তৈরি করা নির্দেশিকা বা কর্মপদ্ধতি পালন করে।

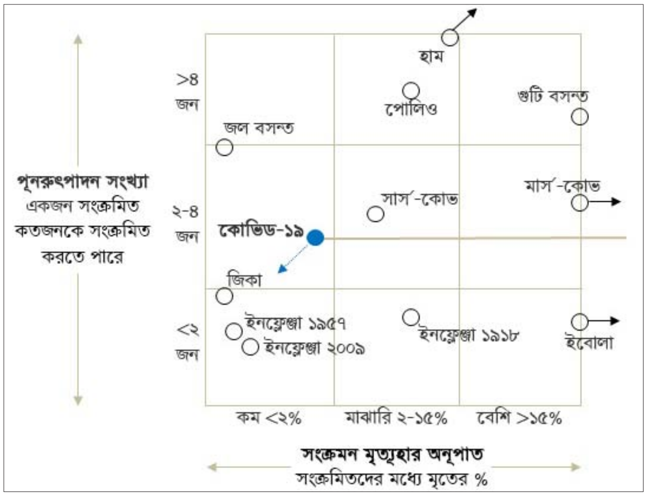

কোভিড-১৯ সহ কিছু ভাইরাসর R_0 ও সিএফআর (সূত্র: WHO)

একটি মহামারীর ধরণ বুঝতে প্রথমে গাণিতিক মডেলিং হয়েছিল গুটি বসন্তের জন্য। ১৭৬৬ সালে সুইস গণিতবিদ ডানিয়েল বার্নোলি এটির উদ্ভাবন করেছিলেন গুটিবসন্তের মৃত্যুহার বিশ্লেষণ করতে। তিনি গুটি বসন্তের টিকা দানের বিষয়ে এই গাণিতিক মডেল তৈরি করেন। এই মডেল থেকে প্রাপ্ত ফলাফল স্পষ্ট দেখিয়েছিল টিকা দানের মাধ্যমে গুটি বসন্ত নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। এ বিষয়ে যুগান্তকারী ভূমিকা দেখান দুই ব্রিটিশ মহামারীবিদ এ জি ম্যাক কেন ড্রিক ও ডাবলিউ ও কেরম্যাক। তাঁদের প্রকাশিত তিনটি গবেষণা পত্রের শৃঙ্খলা ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। আশ্চর্যের কথা তাদের গবেষণার ভিত্তি ছিল বোম্বের (অধুনা মুম্বাই) প্লেগ মহামারী। তাঁদেরকেই আধুনিক রোগ সংক্রমণ মডেলের প্রথম প্রণেতা হিসেবে ধরা হয় এবং সাম্প্রতিক মহামারী মডেলের বিভিন্ন শর্তগুলির সাপেক্ষেও তাঁদের তত্ত্ব যথেষ্ট কার্যকর বলে প্রমাণিত।

সরল মহামারী মডেল (এস আই আর)

মহামারী মডেলের অনেক বৈশিষ্ট্য বা মাত্রা হতে পারে। মানুষের থেকে মানুষের সংক্রমণ ব্যাখ্যা করা যায় 'বিটুইন হোস্ট মডেল'এর মাধ্যমে, ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত জনসমুদায়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী অতিমারী সংক্রমণ ব্যাখ্যা করা যায় 'মেটাপপুলেশন মডেল'এর মাধ্যমে বা পোষক কোষের মধ্যে ভাইরাসের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করা যায় 'উইথ-ইন হোস্ট' মডেল দিয়ে। এখানে আমরা কোভিড-১৯ অতিমারীর জন্য একটি সরল 'বিটুইন হোস্ট মডেল' আলোচনা করব যেটি সরল পরিকাঠামো যুক্ত 'এস আই আর কপার্টমেন্টাল ডিজিজ মডেল'।

এস আই আর মডেলটি একটি কম্পার্টমেন্টাল ডিজিজ মডেল যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিকে 'সংক্রমণ প্রবণ' (Susceptible), 'সংক্রামক' (Infectious) ও 'সংক্রমণ মুক্ত' (Recovered) এই তিন ধরনের জনগোষ্ঠী বিভাগের যে কোনো একটিতে চিহ্নিত করতে হবে। অতিমারী এই ব্যক্তি সংখ্যা এক উপরিউক্ত তিনটি জনগোষ্ঠী বিভাগের একটি থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরিত হতে থাকবে। এস আই আর মডেলের মাধ্যমে একটি সংক্রামক রোগের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কতজন সংক্রামিত হলো তার সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য সংগৃহীত হয়।

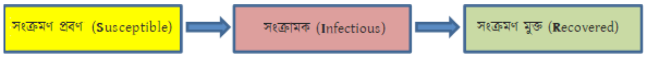

"সংক্রমণ প্রবণ" ব্যক্তিদের এই রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই; সুতরাং, তারা সংক্রামিত হতে পারে। সংক্রমণ প্রবণ ব্যক্তিরা সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে "সংক্রামিত" জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সংক্রামিত ব্যক্তিরা সংক্রমণ প্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারে এবং সময়ের সাপেক্ষে রোগমুক্ত হয়ে "সংক্রমণ মুক্ত" জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সংক্রমণ মুক্ত ব্যক্তিরা সংক্রমণের থেকে সৃষ্ট অনাক্রম্যতার ফলে পুনরায় সংক্রামিত হয় না। এই সাধারণ এস আই আর মডেলটির সাথে নানারকম প্রবর্ধক ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ বিস্তার সম্পর্কে ধারণা করা যাতে পারে।

সংক্রমণ অবস্থার স্বাপেক্ষে এক জনগোষ্ঠী বিভাগ থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরিত হবার কারণে সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি বিভাগের জনসংখ্যা পরিবর্তিত হতে থাকবে। এস আই আর মডেলের সাহায্যে এই জনসংখ্যার পরিবর্তনের গাণিতিক এবং পরিসংখ্যানগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে রোগটির অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই মডেলের কার্যকারিতা অনেকগুলি মানকের ওপর নির্ভরশীল, যেমন সংক্রমণের তীব্রতা, সংক্রমণ হার, রোগীর সংস্পর্শে আসার হার, রোগমুক্ত হবার হার ও অন্যান্য নানা পরিবর্তনশীল বিষয়, যেমন বয়েসের অনুপাত, জনঘনত্বের সমসত্ত্বতা, জনসংখ্যা ইত্যাদি।

এই ধরণের মহামারী মডেলের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা ঐসব রোগ বিস্তারের বিষয়ে গভীরভাবে জানতে পারি, যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুনরুৎপাদন সংখ্যা (R_0)। বিজ্ঞানীরা কোনো মহামারীর বিস্তারের হার বোঝাতে এটি ব্যবহার করেন। R_0-র অনুমান কোনো মহামারীর পরিস্থিতি বোঝার জন্য অপরিহার্য এবং এটি ২০০৩ সালের সার্স অতিমারী, ২০০৯ সালের এইচ১এন১ ইনফ্লেঞ্জা অতিমারী বা ২০১৪ সালের পশ্চিম আফ্রিকার ইবোলা অতিমারীর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে R_0 হলো একজন সংক্রামিত ব্যক্তি সংক্রমণ কালে আরো কতজনকে সংক্রামিত করতে পারে তার গড় সংখ্যা।

কোনো মহামারীর সাপেক্ষে R_0-র মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এর মান ১এর কম হয় তাহলে বুঝতে হবে একজন আক্রান্ত একজনেরও কম ব্যক্তিকে সংক্রামিত করছে। অর্থাৎ সংক্রমণের হার ক্রমহ্রাসমান। অপরপক্ষে R_0-র মান যদি ১এর বেশি হয়, বুঝতে হবে রোগটির সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। সেক্ষেত্রে সেইমতো কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে যাতে R_0-র মান ১এর কমে নেমে আসে। R_0-র মান ১এর সমান হলে বুঝতে হবে রোগের বিস্তার স্থির আছে, অর্থাৎ আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বা কমছে না, এটাকে স্থানীয় সংক্রমণ বলা যেতে পারে।

কোভিড-১৯এর ক্ষেত্রে R_0-র মান ২-৩। বিশ্ব জুড়ে মহামারী বিশেষজ্ঞরা কোভিড-১৯এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশের সাপেক্ষে R_0-র মান নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন যা থেকে ভবিষ্যতে নানা প্রতিরোধী উপায় অনুসরণ করে R_0-র মান কি হতে পারে তা সম্পর্কে আন্দাজ পাওয়া যাবে।

অতিমারীর পরিস্থিতি বোঝার জন্য সংঘটিত মৃত্যুহার (case fatality rate, সিএফআর)ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিএফআর হলো কোনো রোগে আক্রান্তের মধ্যে শতকরা মৃতের সংখ্যা। এর একটি চরম উদাহরণ হলো বিনা চিকিৎসায় জলাতঙ্কে মৃত্যুহার ৯৯%। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে কোভিড-১৯এর সিএফআর সার্স বা মার্সএর থেকেও কম ছিল।

কোভিড-১৯ অতিমারী ও মডেলের প্রয়োগ

মহামারী প্রতিরোধের পন্থা নির্ধারণ মহামারী মডেলের প্রয়োগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মৃত্যুহার নির্ধারণ, অতিমারী বিস্তারে নিয়ন্ত্রণ পাবার উপযোগী পদ্ধতি নিরূপন, প্রাথমিক স্তরে রোগ নির্ণয়, রোগীর পৃথকীকরণ, ন্যূনতম সংস্পর্শ, সামাজিক দূরত্ব, চিকিৎসা, টিকাকরণ প্রভৃতি নানা কর্মপদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব। পৃথকীকরণের দ্বারা কৃত্রিমভাবে R_0 কমানো সম্ভব, আবার সিএফআর কমানো সম্ভব চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নতির দ্বারা।

ডিসেম্বর ২০১৯, অর্থাৎ সার্স-কোভ-২ এর আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই সমগ্র বিশ্বের গবেষকরা বিভিন্ন মহামারী মডেলের প্রয়োগের মাধ্যমে এর বিস্তারের ধারণা ও একে প্রতিহত করার কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন যাতে এর কুপ্রভাবকে ন্যূনতম করা যায়। এইসব মডেলের ভিত্তিতে জানা গেছে দীর্ঘ সময় ধরে সংক্রমণের সংখ্যাকে কমের মধ্যে ধরে রাখার জন্য একান্ত দরকারি হলো সামাজিক দূরত্ব, সংক্রামিত ব্যক্তির পৃথকীকরণ ও সংক্রামিত ব্যক্তির পরিবারের অন্য সদস্যদের গৃহবন্দীকরণ। এখন ভারত সহ অন্যান্য বহু দেশেই এই নিয়মগুলিই জোর দিয়ে মানা হচ্ছে।

বর্তমান কোভিড-১৯এর পেক্ষাপটেই হোক বা কোনো ভবিষ্যৎ মহামারী, এই মহামারী মডেলগুলি স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ, উভয়ক্ষেত্রেই অসামান্য কার্যকরী। এইসব মডেলের থেকে পাওয়া পূর্বাভাস বিশ্বব্যাপী রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা রূপায়ণ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনরক্ষায় সহায়ক। •

লেখক বিজ্ঞান প্রসারের বৈজ্ঞানিক।
ইমেল: Rnath@vigyanprasar.gov.in

এ.আই দ্বারা কোভিড-১৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয়

সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি গোস্বামী ও অম্লান চক্রবর্তী

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কোভিড-১৯ যে বিশ্বত্রাসের সৃষ্টি করেছে সেক্ষেত্রে আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা কোভিড-১৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা আমাদের জানা দরকার। লকডাউন শুরুর সাথে সাথেই টেলিমেডিসিনের গুরুত্ব ভারতে খুবই বেড়ে গেছে এবং এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ন্যাচুরাল লাঙ্গুয়েজ প্রোসেসিং (এনলপি) যা আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।এই 'এনলপি' দ্বারা চালিত চ্যাটবট টেলিমেডিসিনকে সারা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরামর্শ।

সম্প্রতি প্রকাশিত এপিডেমিওলজি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে ডাঃ অনিল কুমার ও তাঁর সহ গবেষক রুপালি রায় তাঁদের এপিডেমিক মডেলে দাবি করেছেন যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সারা ভারতবর্ষ কোভিড ১৯ থেকে মুক্ত হবে। কারন স্বরূপ তাঁরা বলেছেন এই সময়ে সারা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা এবং রোগ থেকে সেরে ওঠার সংখ্যা সমান হবে। যার ফলে তাঁদের এপিডেমিক মডেলের কোয়েফিসিঅ্যান্ট ১০০তে পৌঁছাবে। সুতরাং সমগ্র দেশের লকডাউন সেভাবেই তোলা উচিত বলে তাঁদের দাবি।

এবারে দেখা যাক আমরা কিভাবে আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারা কোভিড ১৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয় করতে পারি। এক্ষেত্রে কনভোলুউস্নাল নিউরাল নেটওয়ার্কের ফ্রেমওয়ার্ক কেরাস এবং টেনসরফ্লো ব্যবহার করেছি কোভিড ১৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয়ের জন্যে। এর সুফল স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এটি আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারা কোভিড-১৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয় 'কোভিড-১৯ টেস্ট কিটে'র একটি বিকল্প পদ্ধতি রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারা অটোমেটেড কোভিড ১৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয় শুধুমাত্র 'কোভিড-১৯ টেস্ট কিটে'র ঘাটতি পূরণই করছে না, একদম কমখরচে এবং অনেক কম সময়ে রোগনির্ণয়েও সাহায্য করছে।

আমরা প্রথমে তথ্য বিশ্লেষণের ধাপগুলিকে বর্ণনা করছি।

(১) ক্যাগল থেকে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চেস্ট এক্স রে (নিউমোনিয়া) ডাটা স্যাম্পল ডাউনলোড করা।

(২) ক্যাগল থেকে সুস্থ ব্যক্তিদের চেস্ট এক্স রে (নিউমোনিয়া) ডাটা স্যাম্পল ডাউনলোড করা।

(৩) কনভোলুউস্নাল নিউরাল নেটওয়ার্ক দ্বারা চেস্ট এক্স রে ডাটা কে ট্রেইন করা।

(৪) টেস্ট ডাটা দ্বারা তথ্য বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয় করা।

চিত্র ১ এ ব্যবহিত ডাটাটির মধ্যে কোভিড ১৯+ কেসগুলি ডাউনলোড করা হয়েছে ডঃ জোসেফ কোহেন এর গিটহাব রিপজিটারী থেকে। মোট ৫০ টি ডাটা স্যাম্পলের মধ্যে রয়েছে ২৫ টি কোভিড ১৯– ও ২৫টি কোভিড ১৯+ স্যাম্পল। ২৫টি কোভিড ১৯– ডাটা স্যাম্পল ডাউনলোড করা হয়েছে ক্যাগল থেকে। মোট ডাটাসেটের ৮০% ব্যবহিত হয়েছে ট্রেনিং ও ২০% ব্যবহিত হয়েছে টেস্ট ডাটাসেট তৈরিতে। এবারে আমরা খুব সংক্ষেপে দেখে নেব কেরাস এবং টেনসরফ্লো ব্যবহারের ফলে আমরা কতটা সঠিকভাবে টেস্ট ডাটাসেটকে নিরীক্ষা করছি। তার সাথে সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি ও যাতে আমরা বুঝতে পারি কতটা সথিকভাবে কোভিড ১৯+ এবং কোভিড ১৯– কেসগুলি ধরতে পারছি।

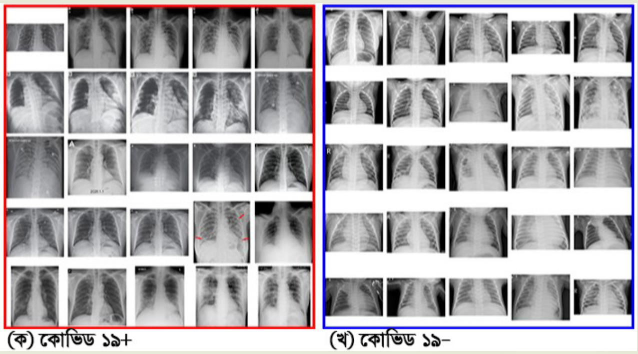

চিত্র ১: কোভিড ১৯+ ও কোভিড ১৯– চেস্ট এক্স রে (নিউমোনিয়া) ডাটা যা কনভোলুউস্নাল নিউরাল নেটওয়ার্কের ফ্রেমওয়ার্ক কেরাস এবং টেনসরফ্লো তে ব্যবহার করা হয়েছে

সুতরাং এখানে দেখা যাছে কেরাস এবং টেনসরফ্লো ব্যবহারের ফলে আমরা ৯০%-৯২% সঠিকতার সাথে টেস্ট ডাটাসেট কে নিরীক্ষা করছি। এমনকি ১০০% সেনসিটিভিটি এবং ৮০% স্পেসিফিসিটি ও আমরা অর্জন করেছি।

ক্যাগল থেকে নেওয়া ইমেজ ডাটার গুনমান ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন যদিও থেকেই যায়। কারণ আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারা গণনার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে প্রাপ্ত ডাটার গুনমানের উপর। ভবিষ্যতে আগামী ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে আরও ভালো গুনমানের ও নির্ভরযোগ্য পর্যাপ্ত ডাটা পাওয়া যাবে আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারা তথ্য বিশ্লেষণের জন্যে। আমরা আশা রাখি আমাদের এই কোভিড ১৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি পাঠকদের অনুপ্রাণিত করবে আরও গভীরভাবে ও সঠিকভাবে এই তথ্য বিশ্লেষণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। •

লেখকেরা যথাক্রমে ভারতীয় বিদ্যাভবন ইন্সিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইমেল: achakra12@yahoo.com